বালক।

শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫ নং চিৎপুর রোড।

চৈত্র ১২৯২ সাল।

সূচী পত্র।

বৈশাখ।

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা।
বিষ্টিপড়ে টাপুর টুপুর—	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	১
কাজের লোক কে?	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	২
সূর্য্যের কথা।	...	নরেন্দ্রবালা দেবী।	...	৬
দার্জ্জিলিং যাত্রা।	...	সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	...	৯
সহজে গান শিক্ষা।	...	প্রতিভাসুন্দরী দেবী।	...	১৩
মুকুট।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	২৩
ব্যায়াম।	...	জ্ঞানদানন্দিনী দেবী।	...	৩৩
গুটিকৃত গল্প।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৪১
আশ্চর্য্য পলায়ন।	...	জ্ঞানদানন্দিনী দেবী।	...	৪৫
স্বাধীনতা।	...	সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৫০
বারো আনা ও ষোল আনা।	...	হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	..	৫১
মুখ চেনা।	...	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৫২
ফুলের ঘা।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৫৬

জ্যৈষ্ঠ।

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা।
মা লক্ষ্মী।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৫৯
লাঠির উপর লাঠি।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৬০
মুকুট।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৬৪
সূর্য্য কিরণের ঢেউ।	...	নরেন্দ্রবালা দেবী।	...	৭২
কাঞ্চন শৃঙ্গ।	...	সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	...	৭৫
চিরঞ্জীবেষু।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৭৭
একরাত্রি।	...	বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৮২
দুর্ভিক্ষ।	...	সরলা দেবী।	...	৮৫
হেঁয়ালি নাট্য।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৮৮
গান অভ্যাস।	...	প্রতিভা দেবী।	...	৯৩
আশ্চর্য্য পলায়ন।	...	জ্ঞানদানন্দিনী দেবী।	...	৯৬
মুখ চেনা।	...	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	১০০
সম্পাদকের নিবেদন।	...	সম্পাদক।	...	১০৩

আষাঢ়।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
সাতভাই চম্পা।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	১০৭
বোম্বায়ের গান বাজানা।	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	১০৯
দশদিনের ছুটি।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	১১৩
আশ্চর্য্য পলায়ন।	জ্ঞানদানন্দিনী দেবী।	১১৮
সূর্য্য কিরণের কার্য্য।	নরেন্দ্রবালা দেবী।	১২৫
রাজর্ষি।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	১২৭
লাঠালাঠি।	প্রাপ্ত।	১৩৪
শ্রীচরণেষু।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	১৩৬
আলোক ও উত্তাপ।	রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায়।	১৪০
গান অভ্যাস।	প্রতিভা দেবী।	১৪৩
হেঁয়ালি নাট্য।	রবান্দ্রনাথ ঠাকুর।	১৪৮
ডম্বেল।	সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।	১৫২
আকবর সাহের উদারতা।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	১৫২
প্রবাদ প্রশ্ন।	সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।	১৫৩
পাঠকদের প্রতি।		

শ্রাবণ।

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা।
রেখাক্ষর বর্ণমালা।	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	১৫৫
বোম্বাই সহর।	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	১৫৯
ন্যায় ধর্ম্ম।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	১৬২
চন্দ্রপুরের হাট।	বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	১৬৩
বীরগুরু।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	১৬৭
বরিশালের পত্র।	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।	১৭২
হাসি রাশি।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	১৭৯
মুখচেনা।	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।	১৮১
রাজর্ষি।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	১৮২
চিরঞ্জীবেষু।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	১৮৯
গান অভ্যাস।	প্রতিভা দেবী।	১৯২
মাংস আহার।	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।	১৯৪
স্বর্গের চিঠি।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	১৯৫

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা।
হেঁয়ালি নাট্য।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	১৯৯
পরীক্ষা।	...	শ্রীমতী।	...	২০১
প্রবাদ প্রশ্ন।	...	সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।	...	২০৪
		ভাদ্র।		
বোম্বাই সহর।	...	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	২০৫
রেখাক্ষর বর্ণমালা।	...	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	২১৩
বৈদ্যনাথ।	...	শরৎচন্দ্র দত্ত।	...	২১৬
বীর জননী।	...	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	২২২
পুরাণো বট।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	২২৬
প্রবাসের চিঠী।	...	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।	...	২৩০
রাজর্ষি	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	২৩৫
গান অভ্যাস।	...	প্রতিভা দেবী।	...	২৪৩
শ্রীচরণেষু।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	২৪৮
বাঘুওরের চাপ।	...	নরেন্দ্রবালা দেবী।	...	২৫১
হেঁয়ালি নাট্য।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	২৫৪
		আশ্বিন ও কার্ত্তিক।		
বোম্বাই সহর।	...	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	২৫৯
পাঠশালা।	...	শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।	...	২৬৬
বাঙ্গালা উচ্চারণ।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	২৬৯
একটি অপূর্ব্ববাড়ি।	...	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	২৭৫
বনপ্রান্ত।	...	বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	২৭৭
কিছুই বৃথা যায় না।	...	হিরণ্ময়ী দেবী।	...	২৭৯
রাজর্ষি।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	২৮৬
সোহাগ।	...	প্রিয়নাথ সেন।	...	৩০৪
ঠগী।	...	কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।	...	৩০৬
চিরঞ্জীবেষু।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৩০৮
ভূমিকম্প।	...	সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।	...	৩১২
কালমৃগয়া।	...	প্রতিভা দেবী।	...	৩১৬
পুরাতত্ত্বের একটি কথা।	...	সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।	...	৩২১
হেঁয়ালি নাট্য।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৩২৮

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা।
নব্যভারতের মানচিত্র।	...	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৩২৬
আকুল আহ্বান।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৩২৭
বড় লোকের মা।	...	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৩২৯
টাহেটি দ্বীপের পার্লামেন্ট।		শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।	...	৩৩১
রুদ্ধ গৃহ।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৩৩৭
জীবন সংগ্রাম।	...	শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।	...	৩৩৯
বরক পড়া।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৩৪১
বাবলাগাছের কথা।	...	সরলা দেবী।	...	৩৪৫
শিখ স্বাধীনতা।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৩৪৭
নূতন স্বরলিপি।	...	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৩৫০
		অগ্রহায়ণ।		
বৈজ্ঞানিক সংবাদ।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৩৫১
বোম্বাই সহর।	...	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৩৫৫
রাজর্ষি।	.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৩৬৪
স্নেহের পুতলি।	...	প্রিয়নাথ সেন।	...	৩৭৪
পথপ্রান্তে।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৩৭৬
সীতারাম রায়।	...	শ্রী মোঃ—	...	৮০
শিউলিফুলের গাছ।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৩৮
শ্রীচরণেষু।	...	কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।	...	৩৮৮
খবরাখবর।	...	শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।	...	৩৯১
হেঁয়ালি নাট্য।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৩৯৮
তর্জমা।	...		...	৪০০
একটি প্রশ্ন।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৪০২
		পৌষ।		
বোম্বাই সহর।	...	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৪১৩
রাজর্ষি।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৪১৭
আহ্বান গীত।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৪২০
কাল-মৃগয়া।	...	প্রতিভাদেবী।	...	৪২৩
উত্তর প্রত্যুত্তর।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৪২৭
খবরাখবর।	...	শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।	...	৪৩০

বিষয়		লেখকের নাম		পৃষ্ঠা।
শ্রীচরণেষু।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৪৩৬
হেঁয়ালিনাট্য।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৪৪০
তারা খসা’।	...	শরৎচন্দ্র দত্ত।	...	৪৪৩
তর্জ্জমা।	...	যোগেন্দ্রনাথ লাহা ও শ্রীমতী ইঃ।	...	৪৪৫
পাঠকের প্রতি।	...		...	৪৪৯
বোম্বাই সহরের পরিশিষ্ট।			...	৪৫৩

মাঘ।

বিষয়		লেখকের নাম		পৃষ্ঠা
বোম্বাই সহর।	...	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৪৫১
দয়ারাম।	...	হৃদয়নাথ মুখোপাধ্যায়।	...	৪৫৯
মঙ্গল-গীতি।	...	শারদাপ্রসাদ স্মৃতিতীর্থ বিদ্যাবিনোদ	...	৪৬৪
ব্রহ্মরাজ থীব।	...	শ্রী ঃ—	...	৪৬৫
নদীয়া ভ্রমণ।	...	শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।	...	৪৬৯
কাল-মৃগয়া (স্বরলিপি)।	...	প্রতিভাসুন্দরী দেবী।	...	৪৭৪
করাচির চিঠি।	...	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।	...	৪৭৮
রাজর্ষি।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৪৮৩
হেঁয়ালি-নাট্য।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৪৮৯
চিরঞ্জীবেষু।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৪৯৬

ফাল্গুন।

বিষয়		লেখকের নাম		পৃষ্ঠা
বিরাথবর।	...	শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।	...	৪৯৯
বোম্বাই সহর।	...	সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৫০২
চিঠি।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৫০৮
নদীয়া ভ্রমণ।	...	শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।	...	৫১২
বাঙ্গালীর গান।	...	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।	...	৫১৭
হাসি।	...	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।	...	৫২০
বৃষ্টি।	...	সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়।	...	৫২২
...দশ বর্ষের বালক।	...	শ্রী ঃ—	...	৫২৩
...র ধারে।	...	বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৫২৬
...বিচার।	...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৫২৯
...নিক সংবাদ।	...	হঃ—	...	৫৩৪
...ফিরে।	...	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।	...	৫৩৭

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা।
সন্ধ্যা। ...	বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ...	৫৩৯
ছায়া পথ। ...	স্বর্ণকুমারী দেবী। ..	৫৪১
গ্রন্থ সমালোচনা। ...	দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ...	৫৪৪
হেঁয়ালি-নাট্যের উত্তর। ...	...	৫৪৬

চৈত্র।

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা।
ডেঞ্চো পিঁপ্ড়ের মন্তব্য।	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ...	৫৪৭
বানরের শ্রেষ্ঠত্ব। ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ...	৫৪৯
কল্পনা, অনুকরণ ও অভ্যাস জনিত রোগ।	ভুবনমোহন মিত্র। ...	৫৫১
খবরাখবর। ...	শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ...	৫৫৩
জন্মতিথির উপহার। ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ...	৫৬০
বাঙ্গালায় বসন্তোৎসব।	শ্রীশচন্দ্র মজুমদার। ...	৫৬২
শ্রীচরণেষু। ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ..	৫৬৭
চিরঞ্জীবেষু। ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ...	৫৬৯
সত্য। ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ...	৫৭১
গয়া। ...	প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। ...	৫৮১
অবসাদ। (বাল্যকালের লেখা)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ...	৫৮৫
হেঁয়ালি নাট্য। ...	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ...	৫৮৭
জাঠ ও বেনে। ...	শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়। ...	৫৯২

বালক।

১ ম ভাগ। } বৈশাখ ১২৯২। { ১ ম সংখ্যা।

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বাণ।

দিনের আলো নিবে এল, সূর্য্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে, চাঁদের লোভে লোভে।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁশর ঘণ্টা বাজ্‌ল ঠং ঠং।
ও পারেতে বিষ্টি এল ঝাপ্‌সা গাছপালা।
এ পারেতে মেঘের মাথায় একশো মাণিক জ্বালা।
বাদ্‌লা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বাণ।"

আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা কোথায় বা সীমানা!
দেশে দেশে খেলে বেড়ায় কেউ করে না মানা।
কত নতুন ফুলের বনে বিষ্টি দিয়ে যায়!
পলে পলে নতুন খেলা কোথায় ভেবে পায়!
মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে!
কত দিনের লুকোচুরী কত ঘরের কোণে!
তারি সঙ্গে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বাণ।"

মনে পড়ে ঘরটি আলো মায়ের হাসিমুখ,
মনে পড়ে মেঘের ডাকে গুরুগুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের পরে দৌরাত্মি, সে না যায় লেখাজোকা।

ঘরেতে দুরন্ত ছেলে করে দাপাদাপি,
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।
মনে পড়ে মায়ের মুখে শুনেছিলেম গান
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বাণ।"

মনে পড়ে সুয়োরাণী দুয়োরাণীর কথা,
মনে পড়ে অভিমানী কঙ্কাবতীর ব্যথা,
মনে পড়ে ঘরের কোণে মিটিমিটি আলো,
চারিদিকে দেয়ালেতে ছায়া কালো কালো।
বাইরে কেবল জলের শব্দ ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্—
দস্যি ছেলে গল্প শোনে একেবারে চুপ্।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে মেঘ্লা দিনের গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বাণ।"

কবে বিষ্টি পড়েছিল, বাণ এল সে কোথা!
শিবুঠাকুরের বিয়ে হল কবেকার সে কথা!
সে দিনো কি এম্নিতর মেঘের ঘটা খানা?
থেকে থেকে বিজুলী কি দিতেছিল হানা?
তিন কন্যে বিয়ে ক'রে কি হল তার শেষে।
না জানি কোন্ নদীর ধারে, না জানি কোন্ দেশে,
কোন্ ছেলেরে ঘুম পাড়াতে কে গাহিল গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদী এল বাণ!"

কাজের লোক কে?

আজ প্রায় চার-শ বৎসর হইল পঞ্জাবে তলবন্দী গ্রামে কালু বলিয়া একজন ক
ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া খাইত। তাহার এক ছেলে নানক। নানক কিছু নিতান্ত ছে
মানুষ নহে। তাহার বয়স হইয়াছে এখন কোথায় সে বাপের ব্যবসা বাণিজ্যে সাহা
করিবে তাহা নহে—সে আপনার ভাবনা লইয়া দিন কাটায়, সে ধর্ম্মের কথা লইয়া
থাকে

কিন্তু বাপের মন টাকার দিকে, ছেলের মন ধর্ম্মের দিকে—সুতরাং বাপের বিশ্বাস হইল এ ছেলেটার দ্বারা পৃথিবীর কোন কাজ হইবে না। ছেলের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া কালু্র রাত্রে ঘুম হইত না। নানকেরও যে রাত্রে ভাল ঘুম হইত তাহা নহে, তাহারও দিনরাত্রি একটা ভাবনা লাগিয়া ছিল।

বাবা যদিও বলিতেন ছেলের কিছু হইবে না, কিন্তু পাড়ার লোকেরা তাহা বলিত না। তাহার একটা কারণ বোধ করি এই হইবে যে, নানকের ধর্ম্মে মন থাকাতে পাড়ার ...াকের বাণিজ্য-ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু বোধ করি তাহারা নানকের ...হারা নানকের ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিল। এমন কি নানকের নামে একটা গল্প ...ষ্ট আছে। গল্পটা যে সত্য নয় সে আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। তবে, লোকে ...রূপ বলে তাহাই লিখিতেছি। একদিন নানক মাঠে গরু চরাইতে গিয়া গাছের ...ায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। সূর্য্য অস্ত যাইবার সময় নানকের মুখে রোদ লাগিতেছিল। ...া যায় না কি একটা কালো সাপ নানকের মুখের উপর ফণা ধরিয়া রোদ্ আড়াল ...য়াছিল। সে দেশের রাজা সে সময়ে পথ দিয়া যাইতেছিলেন—তিনি নাকি স্বচক্ষে ... ঘটনা দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা রাজার নিজের মুখে এ কথা শুনি নাই—...কও কখন এ গল্প করেন নাই—এবং এমন পরোপকারী সাপের কথাও কখন শুনি ...ই—শুনিলেও বড় বিশ্বাস হয় না।

কালু অনেক ভাবিয়া স্থির করিলেন নানক যদি নিজের হাতে ব্যবসা আরম্ভ করেন ...ব ক্রমে কাজের লোক হইয়া উঠিতে পারেন। এই ভাবিয়া তিনি নানকের হাতে ...ছু টাকা দিলেন—বলিয়া দিলেন "এক গাঁয় নুন কিনিয়া আর এক গাঁয়ে বিক্রয় ...রিয়া আইস।" নানক টাকা লইয়া বালসিন্ধু চাকরকে সঙ্গে করিয়া নুন কিনিতে ...লেন। এমন সময়ে পথের মধ্যে কতকগুলি ফকিরের সঙ্গে নানকের দেখা হইল। ...নকের মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি ভাবিলেন এই ফকিরদের কাছে ধর্ম্মের বিষয় ...নিয়া লইবেন। কিন্তু কাছে গিয়া যখন তাহাদিগকে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তখন ...হারা কথার উত্তর দিতে পারে না। তিনদিন তাহারা খাইতে পায় নাই—এমনি ...ন হইয়া গিয়াছে যে মুখ দিয়া কথা সরে না। নানকের মনে বড় দয়া হইল। তিনি ...তর হইয়া তাঁহার চাকরকে বলিলেন "আমার বাপ কিছু লাভের জন্য আমাকে নুনের ...সা করিতে হুকুম করিয়াছেন। কিন্তু এ লাভের টাকা কতদিনই বা থাকিবে! দুই ...নই ফুরাইয়া যাইবে। আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে এই টাকায় এই গরিবদের দুঃখ ...র করিয়া, যে লাভ চিরদিন থাকিবে সেই পুণ্য লাভ করি।" বালসিন্ধু কাজের লোক ...ন বটে কিন্তু নানকের কথা শুনিয়া তাহার মন গলিয়া গেল। সে কহিল "এ বড় ... কথা।" নানক তাঁহার ব্যবসার সমস্ত টাকা ফকিরদের দান করিলেন। তাহারা ... ভরিয়া খাইয়া যখন গায়ে জোর পাইল, তখন নানককে ডাকিয়া ঈশ্বরের কথা শুনা-

হইল। তাহারা নানককে বুঝাইয়া দিল—ঈশ্বর কেবল একমাত্র আছেন আর সমস্ত তাঁহারই সৃষ্টি। এ সকল কথা শুনিয়া নানকের মনে বড় আনন্দ হইল।

তাহার পরদিন নানক বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। কালু জিজ্ঞাসা করিলেন "কত লাভ করিলে?" নানক বলিলেন "বাবা, আমি গরিবদের খাওয়াইয়াছি। তোমার এমন ধনলাভ হইয়াছে যাহা চিরকাল থাকিবে।" কিন্তু সেরূপ ধনের প্রতি কালুর বড় একটা লোভ ছিল না। সুতরাং সে রাগিয়া ছেলেকে মারিতে লাগিল। এমন সময়ে সে-প্রদেশের ক্ষুদ্র রাজা পথ দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার নাম রায়বোলার। নানককে মারিতে দেখিয় তিনি ঘরে প্রবেশ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে? এত গোল কেন? যখন সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন তখন তিনি কালুকে খুব করিয়া তিরস্কার করিলে বলিলেন "আর যদি কখন নানকের গায়ে হাত তোল ত দেখিতে পাইবে।" এমন রাজা অত্যন্ত ভক্তির সহিত নানককে প্রণাম করিলেন। লোকে বলে যে, যখন স নানককে ছাতা ধরিয়াছিল তখন রাজা তাহা দেখিয়াছিলেন এই জন্যই নানকের উ তাঁহার এত ভক্তি হইয়াছিল। কিন্তু সে সাপের ছাতাধরা সমস্তই গুজব—আসল নানকের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে নানক একজন মস্তলো নানকের উপর আর ত মারধোর চলে না। কালু অন্য উপায় দেখিতে লাগিলেন।

জয়রাম নানকের ভগ্নীপতি। পাঠান দৌলৎ খাঁর শস্যের গোলা জয়রামের জিম্মায় ছি কালু স্থির করিলেন নানককেও জয়রামের কাজে লাগাইয়া দিবেন—তাহা হইলে ক্র নানক কাজের লোক হইয়া উঠিবেন। নানকের বাপ যখন নানকের কাছে এই প্রস্ত করিলেন, তখন তিনি বলিলেন "আচ্ছা।" এই বলিয়া নানক সুলতানপুরে জয়রাম কাছে গিয়া উপস্থিত। সেখানে দিনকতক বেশ কাজ করিতে লাগিলেন। সকলে পরেই তাঁহার ভালবাসা ছিল এইজন্য সুলতানপুরের সকলেই তাঁহাকে ভালবাসি লাগিল। কিন্তু কাজে মন দিয়া নানক তাঁহার আসল কাজটি ভুলেন নাই। তি ঈশ্বরের কথা সর্ব্বদাই ভাবিতেন।

এমন কিছুকাল কাটিয়া গেল। একদিন সকালে নানক একলা বসিয়া ঈশ্বরে ধ্যান করিতেছেন, এমন সময়ে একজন মুসলমান ফকির আসিয়া তাঁহাকে বলিল "নানক, তুমি আজ-কাল কি লইয়া আছ বল দেখি? এ সকল কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া দা চিরদিনের যে যথার্থ ধন তাহাই উপার্জ্জনের চেষ্টা কর।"—ফকির যাহা বলিলেন তাহ অর্থ এই যে, ধর্ম্ম উপার্জ্জন কর—পরের উপকার কর—পৃথিবীর ভাল কর—ঈশ্বরে দাও — টাকা রোজগার করিয়া পেট ভরিয়া খাওয়ার চেয়ে ইহাতে বেশী কাজ দেখে।

ফকিরের এই কথাটা হঠাৎ এমনি নানকের মনে লাগিল, যে তিনি চমকিয়া উ লেন, ফকিরের মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূ ভাঙ্গিতেই তিনি গরীব লোকদিগকে ডাকিলেন ও পয়সা যাহা কিছু ছিল সমস্ত তাহাদিগ

দার্জিলিং-যাত্রা।

যখন আমার এম্-এ বন্ধুটিকে সঙ্গে করে তিনটের সময় শেয়ালদহে দার্জিলিঙের গাড়িতে উঠ্‌লুম তখন আমার মনে বড় আনন্দের উদয় হল। উঁচু জায়গার মধ্যে মাণিকতলার খাল কাটার সময়ে মাটি জমা হয়েছিল তাই দেখেছি, আর, অত্যন্ত মোটা রামশঙ্কর কামারকে পাড়ার লোকেরা পর্ব্বত বলে থাকে তাকেও দেখেছি—এর থেকে হিমালয়ের ভাব যতটা পাওয়া যায় তা পাওয়া হয়েছে—কিন্তু এবার স্বয়ং হিমালয়ে সশরীরে যাচ্ছি, হিমালয় পর্ব্বত স্বচক্ষে দেখ্‌ব, এ কথা যতই মনে হতে লাগ্‌ল, আনন্দে আমার বক্ষস্থল হিমালয়ের চেয়ে ফুলে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। এম্—এ বন্ধুটি জয়জয়ন্তি সুরে ভাসিয়ে দে তরী" গানটি চীৎকার কোরে গাইতে লাগ্‌লেন, আর হাতে একটা বই ল সেটাকে বাঁয়া তব্‌লার মত করে নিয়ে কাওয়ালি বাজাতে লাগ্‌লেন। দুজন সহ-ত্রী ইংরেজ তাঁর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। বন্ধুবর যখন ভাবে মগ্ন হয়ে গান গড়েন তখন হাতে-পায়ে ধরে বা চাপা-চুপি দিয়ে তাঁর গান থামান যায় না।

বারাকপুরে এসে গাড়ি থামল, তবে বন্ধুর গান থাম্‌ল। আর একটি ইংরেজ আমা-র গাড়িতে উঠলেন। তিনি খুব লম্বা ও জোয়ান। বড় একজোড়া গোঁপ আছে, ড়ি নাই। চাকরেরা তাঁর জিনিষপত্রগুলো গাড়িতে এনে ফেল্লে, তখন একটি বাক্সের রে তাঁর নাম পড়ে দেখা গেল "Major General H——" অর্থাৎ তিনি ইংরাজ সেনা-দের মধ্যে একটি উচ্চ-পদাবলম্বী। তিনি গাড়ীতে উঠেই আমার বন্ধুবরের কাছে য বস্‌লেন। কোথায় যাব, কি করব, সব জিজ্ঞাসা করলেন। তিনিও দার্জিলিং বন। সাহেবটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে আমি সেখানে আগে থাকতে কোন ড়ি ঠিক করেছি কি না। এ কথা জিজ্ঞাসা করবার কারণ এই, দার্জিলিং যেতে হলে গে থাক্‌তে বাড়ি ঠিক না করলে পথিকেরা বড়ই বিপদে পড়ে, এমন কি শোবার গা পর্য্যন্ত পায় না। বিশেষ পূজার ছুটিতে সেখানে সাহেব ও বাঙ্গালীর অত্যন্ত ড় হয়। আমি বেশ জানি যে বাড়ি ঠিক না কোরে সেখানে গিয়ে অনেকে এ রকম দে পড়েছেন যে তাঁদের তৎক্ষণাৎ কলকাতায় ফিরে আসতে হয়েছে। আমাদের ড় ঠিক ছিল সুতরাং আমাদের কোন রকম বিপদে পড়তে হয়নি। যাহোক্, সেনা-তিটি আমার বন্ধুবরের সঙ্গে খুব গল্প জুড়েছিলেন। তখন ইল্‌বর্ট্ বিলের গোলযোগ ছিল। তিনি ইল্‌বর্ট্ বিলের অত্যন্ত পক্ষপাতী। তিনি বললেন "কতকগুলো গ্লো-ইণ্ডিয়ান খালি চীৎকার কোরে কোরে বেড়াচ্ছে। অ্যাংগ্লো-ইণ্ডিয়ানদের আমি দের সঙ্গে ঘৃণা করি।" তিনি যা বললেন তা তাঁর কার্য্যেও স্পষ্ট দেখা গেল, কারণ যে দুইজন ইংরাজ আমাদের গাড়িতে ছিল তাদের সঙ্গে তিনি একটি কথাও

কইলেন না। এমন কি আমার বন্ধু তাদের সঙ্গে কথা কয়েছিলেন বলে তিনি তাঁকে বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছিলেন। সেনাপতি তাঁর স্ত্রী ছেলে মেয়েদের দার্জিলিং পাহাড়েই বরাবর রেখেছেন। অবকাশমত একবার করে তাঁর বড় মেয়েটিকে দেখ্‌তে যান, তাকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন। এবার তিনি ৪ দিনের ছুটি নিয়েই মেয়েটিকে দেখ্‌তে যাচ্ছেন। আমিও আমার মেয়েটিকে বড় ভালবাসি, তাকে ফেলে কোথাও যেতে পারিনে—যদিও বা যাই তবু মনটা তার কাছে পড়ে থাকে। মেজর সাহেব আমার বন্ধুবরের কাছে এই খবরটি পেয়ে আমার উপরে ভারি প্রসন্ন হলেন। এবার সাহেবের হৃদয় ও আমার হৃদয় এক হ'ল। এতক্ষণ আমি একপাশে বসে চুপ করে তাঁদের গল্প শুন্‌ছিলুম, সাহেব এবার আমার কাছে উঠে এসে গল্প জুড়ে দিলেন। আমাদের সঙ্গে খাবার ছিল, সেনাপতিমশায় তাতে ভাগ বসালেন। পেট-ঠাণ্ডা কোরে সাহেব নিজের বিদ্যের পরিচয় দিলেন, ফার্সি উর্দ্দু শ্লোক আ ড়াতে লাগ্‌লেন। হিন্দুদের উপর তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি প্রকাশ করলেন, বল্‌লে "আমরাও আর্য্য, তোমরাও আর্য্য, কেবল দেশবিশেষে গিয়ে পড়ে আমাদের রঙ সা তোমাদের কাল হয়েছে।" তিনি গল্প করলেন—"একবার ঢাকায় আমি বেড়াতে গি ছিলেম। নদীতে কতকগুলি মেয়ে স্নান কর্‌ছিল—এমন সময় হঠাৎ নৌকায় তাদের এক পরিচিত মেয়ে, বোধ করি, বহুদিন পরে বিদেশ থেকে ফিরে এল। তা দেখে ঘাটের মেয়েরা কতই আনন্দ প্রকাশ করলে, এমন্ কি আনন্দে কেঁদেফে কিন্তু আমাদের একজন মেয়ে যদি অনেকদিন পরে দেশে ফিরে গেল তাকে দেখে আত্মীয় কেবল বলে—"গুড্‌মর্নিং, ক্লারা, কেমন আছ!" এই রকম উত্তম সঙ্গী গল্প কোরতে কোরতে সন্ধ্যা ৭ টার সময় দামুদিয়া ষ্টেশনে পৌঁছলুম। দার্জিলিং যা দের এই ষ্টেশনে নাবতে হয় এবং পদ্মা নদী পার হয়ে অন্য এক ট্রেনে চড়তে আমরা যখন এখানে এসে পৌঁছলুম তখন মুসলধারে বৃষ্টি হচ্চে। জাহাজে ওঠা গেল। পার হতে ১৫ মিনিটের কিছু বেশী লাগে। পার হয়ে দেখি যে সারাঘাট-ষ্টেশনে এক ট্রেন প্রস্তুত আছে। তাতে উঠে পড়লুম। এখানকার গাড়িগুলি ছোট আমাদের জিনিষপত্রে ঘর ভরে গেল দেখে সেনাপতি-মশায় অন্য গাড়িতে গে ট্রেনের, ঝোকানীতে আমার ঘুম বেশ হয়, সুতরাং রাত্তিরটা বেশ কেটে গেল। ৬ টার কিছু আগে জলপাইগুড়ি ষ্টেশনে গাড়ি থামল, আমরা চা খেয়ে নিলুম। ঘণ্টা পরে শিলিগুড়ি ষ্টেশনে গাড়ি থামল। এইখান হতে কলের ট্রামগাড়িতে পাহাড়ে উঠ্‌তে হয়। এখানে দিব্য আহারের স্থান আছে। রুটি ডিম ও আর এক চা খেয়ে নিয়ে ট্রামগাড়ি প্রস্তুত আছে, তাতেই চড়লুম। এখানকার ট্রামগাড়িগুলি ধরণের, খান ১৮ গাড়ি তার মধ্যে প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িগুলি চারিদি সার্সি-দিয়ে ঢাকা বাকিগুলি কতকটা চিৎপুর-রোডের ট্রামগাড়ির মত ফাঁকা। এই

গাড়িতে চড়লে চারিদিকের দৃশ্য বেশ ভাল দেখা যায়, সুতরাং আমরা তাতেই বসলুম। সেনাপতি মশায় এসে আবার আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। সিলিগুড়িতে পৌঁছে যাত্রীদের গরম কাপড় পরতে হয়। আমি কাপড় ছাড়লুম। আমার এম্—এ বন্ধুটি শীতকে বড় ভয় করেন না—সেই জন্যই হউক বা আলস্যের জন্যই হউক সেই সাদা পাতলা কাপড় ছাড়লেন না। সেনাপতি মহাশয় এবার সেই ময়লা কাপড় ছেড়ে সুন্দর গরম কাপড় পরলেন, এবং হ্যাট ফেলে এক উৎকৃষ্ট জরি-দেওয়া পঞ্জাবী পাগড়ী পরলেন। এই পাগড়ী পরাতে তাঁকে বড় সুন্দর ও জমকালো দেখাচ্ছিল। আমার ন্ধুবর তাঁর নতুন বেশ দেখে তাঁকে "যাকুব খাঁ" বলে ডাক্‌তে লাগলেন। "যাকুব খাঁ" ় মজার লোক। তিনি এ-গাড়ি ও-গাড়ি করে, সকলের সঙ্গে হাসি-তামাসা করে ড়াতে লাগ্‌লেন। তিনিই একরকম সকলকে আমোদে রেখেছিলেন। ট্র্যাম গাড়ি ড়ল। আনন্দে বন্ধুবর গান বন্ধ করে শিষ দিতে আরম্ভ করলেন। চারিদিকে ধানের ত, মধ্যে মধ্যে চা-ক্ষেত্রের সুন্দর শোভা দেখ্‌তে দেখ্‌তে গাড়ি পাহাড়ের নীচে এল। বার পাহাড়ের উপর উঠতে আরম্ভ করা গেল। ঘন এক শাল বনের মধ্য দিয়ে ড় চলেছে, চারিদিকে বড় বড় শালগাছ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। খানিক র গাড়ি ঘুরে এক ফাঁকা জায়গায় এল, তখন নীচের দিকে চেয়ে দেখি আমরা পাহা- র উপরে। কখন দক্ষিণে প্রকাণ্ড পাহাড়, বামে খদ, কখন বা দক্ষিণে খদ্ ও বামে াড়। ট্র্যামের রাস্তা মস্ত সাপের মত পাহাড়কে ঘিরে ঘিরে অল্প অল্প উঁচু হয়ে উপরে ছে। এইরূপে ঘুরতে ঘুরতে চল্লুম। এই যে ছবি এঁকেছি এতে গাড়ির পথ কত- া বোঝা যাবে। মাঝে মাঝে ষ্টেশন আছে। প্রথম ষ্টেশন "তিন-দরিয়া" সিলি- ড় থেকে ৯ ক্রোশ, এখানে ট্রেণ ১৫ মিনিট থাকে, এবং অল্প আহার্য্যও পাওয়া যায়। ন দরিয়া" থেকে যখন গাড়ি ছাড়ল, তখন চতুর্দ্দিকে মেঘ, ঘন কোয়াশার মত া হোয়ে চারদিক ঘিরে রয়েছে। মেঘের ভিতর দিয়ে গাড়ি চলতে লাগল। আশে- শের ঘর বাড়ি ছাড়া দূরের কিছুই দেখা যায় না, সমস্ত মেঘে ঢাকা। এক ক্রোশ উপরে ন গাড়ি উঠ্‌ল তখন ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি হতে লাগ্‌ল। বৃষ্টি হচ্ছে, মেঘ ঈষৎ কেটে ্ছে, নীচের পাহাড়ে চেয়ে দেখি সেখানে দিব্যি রৌদ্র ফুট্‌ফুটে করছে। এইরূপ র্য্য দৃশ্য দেখতে দেখতে মনে হল পৃথিবী ছেড়ে উপরে স্বর্গের পথে যাচ্চি। প্রায় ় মিনিট পরে "গয়াবাড়ি" ষ্টেশনে পৌঁছলুম। এখান থেকে গাড়ি ছাড়লে নীচের াড়ে কতকগুলি চাক্ষেত্র দেখা যায়। দূর থেকে চাক্ষেত্রগুলি অতি সুন্দর দেখায়, হয় যেন পাহাড়ের গায়ে কে ছোট ছোট সবুজ কৌটা পরিয়ে দিয়েছে। তার পর ামরা "কার্সিয়ং" ষ্টেশনে পৌঁছলুম। পূর্ব্বে এ একটি ক্ষুদ্র পাহাড় পল্লি ছিল মাত্র, ় ক্রমে পাহাড়ের সমস্ত ষ্টেশনের মধ্যে একটি প্রধান সহর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। "কার্সিয়ং" ০০ ফিট্ উঁচু। যখন এখানে পৌঁছলুম তখন আমি শীতে কাঁপছি, কিন্তু আমার

বন্ধুবরের সেই বেশ। কেবল পাছে কাণে ঠাণ্ডা লাগে এই ভয়ে মাথার উপর দিয়া এক রুমালের ঘোম্‌টা দিয়েছিলেন, কিন্তু গুণ্‌গুণ্‌স্বরে গান বন্ধ হয় নি। "যাকুব খাঁ" আমার বন্ধুবরকে বল্লেন "তুমি করচ কি?—কাপড় এখনও ছাড় নি? শীঘ্র গরম কাপড় পর, নইলে তোমার অত্যন্ত অসুখ হবে।" কিন্তু আমার বন্ধুবরের অসাধারণ সাহস, তিনি ভূতকে ভয় করেন, কিন্তু শীতকে ভয় করেন না। শীতকে ভয় না করে তাঁর পরিণাম যা হয়েছিল তা পরে বলব। এখানে উত্তম আহার পাওয়া যায়। ভাল দৃশ্যের চেয়ে সেটা এক এক সময়ে বড় আবশ্যক বোধ হয়।

এর পর "সোণাদহ" ষ্টেশন, এ একটি ক্ষুদ্র পল্লি, কতকগুলি অপরিষ্কার বাজার দেখা যায় মাত্র। এখান থেকে ছেড়ে "ঘুম" ষ্টেশনে পৌঁছান গেল। অনেকে বলেন যে পৃথিবীর কোন পাহাড়ের উপর এত উচ্চে রেলগাড়ি যায় নি। ইহা ৭৪০০ ফি[illegible] উচ্চ। দার্জ্জিলিং এই স্থান থেকে ২ ক্রোশ নীচে, সুতরাং গাড়ি নীচে নাব্‌তে আর[illegible] করলে। নাববার সময় দক্ষিণ দিকে "জলা পাহাড়ের" উপরে সৈন্যদের বারিক [illegible] অল্প দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এবং বামে অনেক দূরে "টঙলু পর্ব্বত" ও হিমালয়ের [illegible] "সিঙ্গলীলা" এবং নিকটে সারি সারি অনেক চাক্ষেত্র দেখা যায়। এক ক্রোশ নী[illegible] যখন গাড়ি নাবল তখন দূর থেকে দার্জ্জিলিঙের ছোট ছোট সাদা সাদা বাড়িগুলি পাহ[illegible] ড়ের গায়ে ছবির মত বোধ হতে লাগল। এইরূপে মেঘ, বৃষ্টি, রৌদ্রের মধ্যে দি[illegible] পাহাড়, নদী, নির্ঝর, এবং নানা প্রকার মনোহর দৃশ্য দেখতে দেখতে, দার্জ্জিলিঙে এ[illegible] পৌঁছলুম। শিলিগুড়ি থেকে দার্জ্জিলিং ২৪ ক্রোশ এবং সেখান থেকে দার্জ্জিলিং পৌঁছ[illegible] ছ ঘণ্টা লাগে। এই ছ ঘণ্টা যে কি সুন্দররূপে অতিবাহিত হয় তা লিখে বর্ণনা কর্[illegible] আমি একেবারে অক্ষম। বেলা ১০ টার সময় শিলিগুড়ি ছেড়ে বৈকাল ৪ টের স[illegible] দার্জ্জিলিং পৌঁছলুম। তখন বেশ রৌদ্র আছে। দার্জ্জিলিঙে আমাদের একটি [illegible] আছেন, তাঁর বাড়িতেই আমাদের থাকা হবে। গাড়ি থেকে নেবে বন্ধুর অন্বেষণ কর[illegible] তাঁর সাড়া শব্দ পেলেম না। পাহাড়ে রাস্তা, কখন উপরে, কখন নীচে নেবে বা[illegible] খুঁজতে হবে, যদি সন্ধ্যে হয়ে পড়ে ত কি করি। এই এক ভাবনা, তারপর আর এ[illegible] বিষম ভাবনা এসে দেখা দিলে। আমার সঙ্গীটি জ্বরে থরথর করে কাঁপ্‌চেন, অ[illegible] তাঁর দাঁতে বেদনা হয়েছে। বন্ধুবর সহজ অবস্থায় দেহভার নিয়ে চল্‌তে পারেন [illegible] হাঁপিয়ে পড়েন। তাতে আবার জ্বর ও দাঁতকন্‌কনানি হয়েছে। বিষম বিভ্রাট। তি[illegible] আমার শরীরে তাঁর সমস্ত ভর দিয়ে (সে ভর বড় কম নয়) আস্তে আস্তে চল্‌তে লা[illegible] লেন। এত অসুখ তবু গান ছাড়েন নি। গুন গুন কোরে গান গাইতে গাইতে পাহা[illegible] নাব্‌চেন, আর মাঝে মাঝে বল্‌চেন "আস্তে, দেখ যেন পোড়ো না।" খানিক দূর গি[illegible] দেখি আমাদের বন্ধু গ—বাবু দৌড়ে এক পেয়াদা সঙ্গে নিয়ে আস্‌চেন। ক্রমে তাঁর বা[illegible] এসে পৌঁছলুম। এম্—এ বন্ধুটি আর বস্‌তে বা দাঁড়াতে পারলেন না। একেব[illegible]

দার্জিলিং

৬ খানা কম্বল জড়িয়ে খাটে শুয়ে পড়লেন। আজকের দিন রোগীর সেবায় ব্যস্ত রইলুন। এর থেকে এই মহৎ উপদেশ পাওয়া যাচ্ছে যে, পুজোর ছুটির সময় দার্জিলিঙে আস্‌তে হলে খুব গরম কাপড় সঙ্গে আনা আবশ্যক, নইলে পরিণামে যে দশা হবে তা বলা বাহুল্য—বন্ধুবরই তার প্রকাণ্ড দৃষ্টান্ত স্থল।

সহজে গান-শিক্ষা।

সঙ্গীত যে কাহাকে বলে তাহা বোধ করি বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। মনের ভাব সুর দিয়া ব্যক্ত করাকেই সঙ্গীত বলে। কেহ কেহ বলেন্ পাখীদের ডাক্ অনুকরণ করিয়া মানুষ প্রথমে গান করিতে শেখে। আরো নানা লোক নানা কথা বলে। কিন্তু সে সকল কথার সত্য-মিথ্যা কি করিয়া স্থির করা যাইবে? আমার বোধ হয় গান মানুষের স্বাভাবিক। মানুষের হাসি-কান্নার সুর আছে। সুখের সময় দুঃখের সময় মানুষের গলার সুরের বদল হয়। নানা ভাবের নানা সুর আছে। তাহা এমনি স্বাভাবিক যে সেই সুর শুনিলে আমরা মানুষের মনের ভাব টের পাই। কোন ভিক্ষুক যদি মিনতির সুরে আমাদের কাছে ভিক্ষা চায়, তবে আমরা তার মনের কাতরতা বুঝিতে পারি ও আমাদের মনে দুঃখের উদ্রেক হয়। এইরূপ আমাদের ভাবের সঙ্গে সঙ্গে একটি না একটি সুর লাগিয়া থাকে সেই সুরের চর্চ্চা করিয়াই বোধ করি গানের উৎপত্তি ও উন্নতি হইয়াছে।

কি করিয়া গানের আরম্ভ হইল তাহা জানিবার তত দরকার দেখিতেছি না। আপাততঃ ভাল করিয়া গান গাহিতে শিখিলে অনেক কাজ দেখে। গান গাহিয়া পরকে সুখী করা ও নিজে সুখ পাওয়া ইহা অপেক্ষা আনন্দ আর কি হইতে পারে?

আমাদের পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে অনেকেরই ভাল গলা আছে, এবং অনেকে গানও গাহিয়া থাকেন্। তাঁহাদের ভাল গানের পুঁজি যাহাতে আরও বাড়ে আমাদের এই ইচ্ছা। এইজন্য লিখিয়া সহজে গান-শিখিবার একটা উপায় অবলম্বন করা গিয়াছে। যে প্রণালীতে আমরা গানের সুর লিখিয়া পাঠকদের শিক্ষার জন্য প্রকাশ করিব তাহা পোনেরো ষোলো বৎসর হইল তত্ত্ববোধিনীতে বাহির হইয়াছিল। * ইহার সহজ সংকেত একবার শিখিয়া লইলে গান-শিক্ষা অনেক সহজ বোধ হইবে।

---

* এখানে গীত লিখিবার যেরূপ সংকেত বলিয়া দেওয়া হইবে, তাহা ১৭৯১ শকের কার্ত্তিক মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল,—এবারে দুই একটি বিষয় পূর্ব্বাপেক্ষা আরো সহজ করিয়া দেওয়া হইবে।

আজ কাল অনেকেরই ঘরে পিয়ানো অথবা হারমোনিয়ম আছে। তাঁহাদের পক্ষে গান-শিক্ষার বিশেষ সুবিধা হইবে। ভাষার পক্ষে ক খ যেমন—সঙ্গীতের পক্ষে সা রে গা ম তেম্‌নি। যাঁহাদের ঘরে পিয়ানো প্রভৃতি যন্ত্র আছে তাঁহারা বোধ করি সা রে গা ম কাহাকে বলে জানেন, যদি বা না জানেন্—কাহারো কাছে জানিয়া লইতে পারেন। কারণ বই পড়িয়া সা-রে-গা-ম'র বিষয় শিক্ষা করা বড় সোজা নয়। তবু যত সংক্ষেপে পারি এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখিয়া দিই।

মানুষের গলা হইতে বা নানা বাজনা হইতে অনেক সুর বাহির হইতে পারে। কিন্তু সেই সমস্ত সুরকে গান বাজনা, শিখিবার সুবিধার জন্য ভাগ করিয়া ফেলা হইয়াছে। প্রত্যেক ভাগে মোটামুটি সাতটা করিয়া সুর থাকে। এই জন্য এক একটী ভাগকে এক একটী সপ্তক বলে। এই সপ্তকের সুরের সাতটি নাম সা রে গা ম পা ধা নী। সচরাচর পিয়ানো কিংবা হারমোনিয়ম যন্ত্রে পাঁচ ছয় সপ্তকের বেশী থাকে না। বড় বড় গুলিতে ছয় সাত সপ্তকের অধিক দেখা যায়। অপর পৃষ্ঠায় পিয়ানো যন্ত্রের যে ছবি দেওয়া হইয়াছে—তাহার বন্ধনী (Bracket) চিহ্নিত এক একটী অংশকে এক একটী সপ্তক বলে। কিন্তু আমাদের দেশী গানে তিন সপ্তকের অধিক সুর ব্যবহার হয় না। ইহা বলিয়া যে সকলেই তিন সপ্তক সমানরূপে উচ্চারণ করিতে পারেন তাহা নয়। মধ্য সপ্তকটা স্বাভাবিক সকলেরই গলায় আইসে প্রথম সপ্তক আর তৃতীয় সপ্তক গলায় বাহির করা কাহারো কাহারো শক্ত ঠেকিতে পারে। কিছু কাল ধরিয়া গলা সাধিলে তাহা তাঁহাদের সহজ হইয়া যাইবে। এই তিন সপ্তকের মধ্যে মাঝের সপ্তকটাকে উদারা, নীচের সপ্তকটাকে মুদারা আর তৃতীয় সপ্তককে তারা কহে। আমাদের সঙ্গীতে এই তিন সপ্তকই ব্যবহার হইয়া থাকে। পিয়ানো কি হারমোনিয়া যন্ত্রের যেখানে পাশাপাশি দুইটী কালো ফলক দেখিতে পাইবে সেই দুইটীর বামদিক ঘেঁসিয়া যে একটী সাদা ফলক আছে, জানিবে যে, তাহাতেই সা সুর বাজে, তাই তাহাকে সা ফলক বলিয়া ধরা যাক্। আর যেখানে সারিবন্দী তিনটী কালো ফলক দেখিতে পাইবে, সেই তিনটীর বামদিক ঘেঁসিয়া যে একটী সাদা ফলক আছে জানিবে যে তাহাতেই ম সুর বাজে, তাই তাহাকে ম ফলক বলিয়া ধরা যাক্। এইরূপে সা আর ম জানিতে পারিলে অন্য সুর-স্থান গুলি বাহির করিয়া লওয়া অতি সহজ। সা'র পর রে, রে'র পর গা, গা'র পর ম এই রকম পরে পরে সাদা ফলকগুলিতে হাত দিলেই সা রে গা ম পা ধা নী এই সাতটী সুরের স্থান জানিতে পারিবে, এবং ঐ সাতটী সাদা ফলককে সা ফলক রে ফলক গা ফলক ম ফলক ইত্যাদি শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইবে। অনেকবার বাজাইয়া যন্ত্রেতে সপ্তকগুলি হাতে এমন অভ্যাস্ করিয়া লইতে হইবে যে যন্ত্র দেখিয়া ভাবিতে না হয় কোনটী সা কোনটী রে ইত্যাদি।

সা রে গা ম সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা বাকী আছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি এক একটী সপ্তকের মধ্যে মোটামুটি সাতটী করিয়া সুর আছে। কিন্তু সেই সাতটী সুরের আর পাঁচটী ডাল পালা আছে। ঐ সাতটী সুরকে শুদ্ধ সুর বলে আর ডালপালা গুলিকে কোমল ও তিব্র সুর বলে * সাতটী শুদ্ধ সুরকেই সচরাচর সুর বলে। আর, কোমল তিব্র প্রভৃতি যতগুলি ডাল পালা আছে সে গুলিকে শ্রুতি কহে। সেই শ্রুতি গুলির মধ্যে এখনকার পক্ষে যে গুলি সচরাচর দরকারি তাহা পাঁচটী মাত্র,—কোমল রে, কোমল গা, কোমল ধা এবং কোমল নী এই চারিটী কোমল সুর ও কড়ি মধ্যম (এই একটী তিব্র সুর বা কড়ি সুর) সর্ব্বশুদ্ধ ধরিয়া পাঁচটী। হারমোনিয়ম যন্ত্রের যে ছবি দেওয়া হইয়াছে তাহার সাদা ফলকগুলি শুদ্ধ-সুরের স্থান ও কালো ফলকগুলি কোমল ও তিব্র সুরের স্থান।

কোমল সুর কাহাকে বলে? মোটামুটি বলা যাইতে পারে, যে, শুদ্ধ-সুর অর্দ্ধেক পরিমাণে কমিয়া আসিলে কোমলে দাঁড়ায়। আমাদের সঙ্গীতে রে গা ধা নী এই চারিটী সুরের কোমল সুর ব্যবহার হইয়া থাকে। কোমল রে বলিলে শুদ্ধ রে'র একটু নীচু সুর বুঝায় অর্থাৎ যে সুর সা-ও নয় রে-ও নয় কিন্তু দুয়ের ঠিক মাঝামাঝি। যেমন গোলাপ ফুলের রং জবা ফুলের মত অতটা লাল নয় আর যুঁই ফুলের মত সাদা নয় কিন্তু দুয়ের মাঝামাঝি, তেমনি কোমল রে রে'র মত অতটা উঁচু সুর নয় ও সা'র মত অতটা নীচু সুর নয় কিন্তু সা এবং রে দুয়ের মাঝামাঝি। যে সাদা ফলকে শুদ্ধ-রে বাজে তাহার বাম পার্শ্বের কালো ফলকে কোমল রে বাজে। যে সাদা ফলকে শুদ্ধ-গা বাজে তাহার বামপার্শ্বের কালো ফলকে কোমল গা বাজে। যে সাদা ফলকে শুদ্ধ ধা বাজে তাহার বামপার্শ্বের কালো ফলকে কোমল ধা বাজে। যে সাদা ফলকে শুদ্ধ-নী বাজে তাহার বামপার্শ্বের কালো ফলকে কোমল নী বাজে।

কড়ি সুর কাহাকে বলে? মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে শুদ্ধ সুর অর্দ্ধেক পরিমাণে চড়িলেই কড়ি সুর হয়। আমাদের সঙ্গীতে কেবল ম-সুরেরই কড়িসুর আছে। কড়ি ম শুদ্ধ-ম অপেক্ষা একটু উঁচু সুর কিন্তু তাহা পা অপেক্ষা একটু নীচু। যে সাদা ফলকে শুদ্ধ-ম বাজে তাহার ডান পার্শ্বের কালো ফলকে কড়ি ম বাজে। সা এবং পা'র কোমলও নাই কড়িও নাই।

তাল।

কবিতায় যেমন ছন্দ সঙ্গীতের তেমনি তাল। আমরা যখন কথা কহি তখন

---

* আবার ডাল পালারও ডালপালা আছে—এগুলিকে অতি-কোমল ও তরতিব্র সুর বলে। অতি কোমল ও তরতিব্র সুরগুলি সহজে কানে ধরা পড়ে না, এ জন্য সে গুলির কথা এখন থাক।

আমাদের বেশী ভাবিতে হয় না, কিন্তু যখন পয়ার লিখি তখন কথার শব্দ গুনিয়া গুনিয়া বাড়াইয়া কমাইয়া ভাগ করিয়া লিখিতে হয়। মনে কর আমি মুখে বলিলাম "মহাভারতের কথা অমৃতের ন্যায় মধুর, কাশীরামদাস বলিতেছেন ও পুণ্যবানেরা শুনিতেছেন" ইহার মধ্যে ছন্দ নাই অর্থাৎ কথা ভাগ করা নাই কিন্তু এই কথাটা পয়ারে বাঁধিতে হইলে নিম্ন লিখিত রূপে ভাগ করিতে হয়—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্।

উপরের ঐ দুইটী পংক্তিকে দুইটা চরণ কহে। আবার প্রত্যেক চরণের চারিটী করিয়া ভাগ আছে। যথা—

মহাভার। তের কথা। অমৃতস। মান ••।
কাশীরাম। দাস কহে। শুনে পুণ্য। বান ••।

• চিহ্নিত শেষ ভাগে দুইটী মাত্র অক্ষর কিন্তু অন্য ভাগ গুলিতে চারিটী করিয়া অক্ষর, ইহার অর্থ আছে। উপরে যে দুটী শূন্যের চিহ্ন দেখিতেছ—মনে কর যে ঐ দুইটী শূন্য শব্দ, কিন্তু সে দুটী শব্দ উচ্চারণ না করিয়া—তাহা উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় চুপ করিয়া থাকা হইল তাহা হইলেই দাঁড়াইতেছে সময়ের ভাগ আগা গোড়া সমান।

ঐ দুই শূন্যের জায়গা কথা দিয়া পূরণ করিলে এই রূপ দাঁড়াইবে—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান আহা
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান তাহা।

উহার ভাগ এই রূপ—

মহাভার। তের কথা। অমৃত স। মান আহা।
কাশীরাম। দাস কহে। শুনে পুণ্য। বান তাহা।

এবারে প্রত্যেক ভাগে চারি চারি অক্ষর, উপরে "আহা" এবং "তাহা"র জায়গায় চুপ করিয়া গেলেই পূর্ব্বেকার মত দাঁড়াইবে, কিন্তু আহা এবং তাহা উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে ঠিক ততটুকু সময় ধরিয়া চুপ করা চাই, তাহা হইলেই সময়ের ভাগ আগাগোড়া সমান থাকিবে।

উপরে কবিতার চরণের যেরূপ ভাগ দেখা গেল, গানের চরণেরও সেইরূপ ভাগ আছে। গানেতে সময়ের ভাগ কিরূপ নীচে তাহার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। নিম্নে গানটী দেখ—

ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে মৃদু মৃদু বায়ু বহে ;
লতা পাতা হেলে দুলে কত কি যে কথা কহে।

ইহার ভাগ।

১	২	৩	৪	
ফুলে ফুলে।	ঢলে ঢলে।	মৃদু মৃদু।	বায়ু বহে।	(এইটী প্রথম পদ)
১	২	৩	৪	
লতা পাতা।	হেলে দুলে।	কত কি যে।	কথা কহে।	(এইটী দ্বিতীয় পদ)

উপরে যে দুইটী চরণ বা পদ উদ্ধৃত করা হইল তাহাকে কিরূপ ভাগ করা হইয়াছে একবার দেখ। ঐ গানের ঐ দুইটী পদ, প্রত্যেক পদে চারিটী ভাগ আছে, প্রত্যেক ভাগে চারিটী অক্ষর আছে। ঐ চারিটী অক্ষরকে চারিটী মাত্রা বলা যাক। সূক্ষ্ম ধরিতে গেলে, উপরের গানটীতে এক একটী অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগিতেছে, সেইটুকু সময়কেই মাত্রা বলে, অক্ষরকে মাত্রা বলে না, আমরা কেবল মোটামুটি অক্ষরকে মাত্রা বলিলাম, পাঠকেরা বুঝিয়া লইবেন যে তাহা অক্ষর-উচ্চারণের সময় মাত্র। পাঠক যদি উপরের গানের প্রত্যেক ভাগের প্রথম অক্ষরে ঝোঁক (accent) দিয়া পাঠ করেন তাহা হইলে উহার ছন্দটী শ্রোতার কর্ণে স্পষ্ট করিয়া ফুটাইয়া দেওয়া হয়। গানের বেলায় ঝোঁকের স্থলগুলি তালি দিয়া বা বাজনায় জোরে ঘা দিয়া ব্যক্ত করা হয়,—ইহাকেই তাল দেওয়া কহে। উপরের গানে "ফুলে ফুলে" এই চারিটী অক্ষরের প্রথম অক্ষরে ঝোঁক দিলেই বাকি তিনটী অক্ষরে আর ঝোঁক দিবার আবশ্যক হয় না, ঐ এক-ঝোঁকে চারিটী অক্ষর খাইয়া যায়, আবার দ্বিতীয় ঝোঁক "ঢলে ঢলে" শব্দের প্রথম অক্ষরে পড়ে—তাহাতেই "ঢলে ঢলে" এই চারিটী অক্ষর পার হইয়া যায়, এই এক-একটী ঝোঁক (কি না এক-একটী তাল) নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে—এখানে যেমন দেখা গেল যে প্রত্যেক তাল চারিটী করিয়া মাত্রা অধিকার করিয়া আছে। মাত্রা কাহাকে বলে তাহা নীচে আরো পরিষ্কার করিয়া দেখানো যাইতেছে।

মাত্রা।

একমাত্রা কাহাকে বলে? ক খ গ ঘ সহজ-ভাবে (অর্থাৎ খুব শীঘ্রও নয় খুব বিলম্বেও নয়) উচ্চারণ করিলে প্রত্যেক অক্ষর উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে তাহাই একমাত্রা কাল। একমাত্রার অর্দ্ধেক কালকে অর্দ্ধমাত্রা কাল কহে। দুই মাত্রা, অর্থাৎ একমাত্রার দ্বিগুণ। সংস্কৃত ছন্দমাত্রেই হ্রস্ব স্বর (যেমন "ই") এক মাত্রা ও দীর্ঘস্বর (যেমন "ঈ") দুই মাত্রা কালে উচ্চারিত হয়। তিন মাত্রা, অর্থাৎ এক মাত্রার তিনগুণ। চারি মাত্রা, অর্থাৎ এক মাত্রার চারিগুণ। এইরূপ প্রণালীতে পাঁচ মাত্রা

ছয় মাত্রা প্রভৃতি যত মাত্রা ইচ্ছা তত মাত্রা কাল নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইহার উদাহরণ ;—

কি—এক মাত্রা। কিই—দুই মাত্রা। কিইই—তিন মাত্রা। কিইইই—চারি মাত্রা।

কি এবং ই-উচ্চারণ কালে প্রত্যেক কি এবং প্রত্যেক ই ঠিক সমান সহজ-ভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে ; অর্থাৎ খুব শীঘ্রও নয় খুব বিলম্বেও নয়।

আমরা যখন গান লিখিব তখন, গানের কথাগুলি নীচে লেখা হইবে এবং তাহার যে যে অক্ষরে যে যে স্বর লাগে সেই সেই স্বর সেই সেই অক্ষরের উপরে লিখিত হইবে। যে স্বর কেবলমাত্র একটা অক্ষরের উচ্চারণ কাল পর্য্যন্ত গাহিতে হইবে তাহার পাশে একটা মাত্রার চিহ্ন থাকিবে ; যেমন সা-। অর্থাৎ সহজ ভাবে "ক" বলিতে যত সময় লাগে সেই টুকু সময় ব্যাপিয়া সা উচ্চারণ করিবে ; সা- - এখানে সা'র পরে দুইটা মাত্রার চিহ্ন দেওয়া হইল, এবারে "ক" দুইবার উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় ব্যাপিয়া সা উচ্চারণ করিতে হইবে, সংক্ষেপে, সা- -কিনা সা আ, তেমনি স্বরের গায়ে তিনটী মাত্রার চিহ্ন দিলে দাঁড়াইবে যে ক তিন-বার উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় ব্যাপিয়া সেই স্বর উচ্চারণ করিতে হইবে, নিম্নে দেখ—

সা-, অর্থাৎ সা, এক মাত্রা। সা- -, অর্থাৎ সা আ, দুই মাত্রা। সা- - - অর্থাৎ সা আ আ, তিন মাত্রা। সা- - - -অর্থাৎ সা আ আ আ, চারি মাত্রা ইত্যাদি।

একমাত্রার চিহ্ন যেমন কসি অর্দ্ধমাত্রার চিহ্ন তেমনি বিন্দু। যথা সা৹। স্বরের সঙ্গে কিরূপ মাত্রা-চিহ্ন যোজনা করিতে হয় তাহার উদাহরণ—

সা—গা—গা—গা— ম—ম—পা—পা—

শ —ভ শ—ভ— শ—ভ—দ—ন—

উপরে সকল স্বর-গুলিই একমাত্রা কালে উচ্চারণ করিতে হইবে—তাই উপরের কোন স্বরেই একটির অধিক মাত্রা চিহ্ন নাই। অর্দ্ধমাত্রার চিহ্নও নাই।

গানের স্বরগুলি কখন তারা-সপ্তকে উঠে, কখন বা মুদারা-সপ্তকে নাবে, কখন বা উদারা সপ্তকে থাকে। মুদারা সপ্তকের স্বরের নীচে কসি চিহ্ন দেওয়া হইবে ; যেমন সা। আর তারা সপ্তকের স্বরের মাথার উপরে কসি চিহ্ন থাকিবে ; যেমন সা। যে স্বরের উপরে কিম্বা নীচে কসি চিহ্ন না থাকিবে তাহাই জানিবে উদারা সপ্তকের অর্থাৎ মধ্যসপ্তকের স্বর ; যেমন সা। নিম্নে দেখ ;—

মুদারা অর্থাৎ নিম্ন সপ্তক	উদারা অর্থাৎ মধ্য সপ্তক	তারা অর্থাৎ উচ্চ সপ্তক
$\underline{\text{সা}}$	সা	$\overline{\text{সা}}$
$\underline{\text{রে}}$	রে	$\overline{\text{রে}}$
$\underline{\text{গা}}$	গা	$\overline{\text{গা}}$
$\underline{\text{ম}}$	ম	$\overline{\text{ম}}$
$\underline{\text{পা}}$	পা	$\overline{\text{পা}}$
$\underline{\text{ধা}}$	ধা	$\overline{\text{ধা}}$
$\underline{\text{নী}}$	নী	$\overline{\text{নী}}$

নিম্নের গানে যে সুরের মাথার উপরে কসি চিহ্ন দেখিবে তাহা উচ্চ সপ্তকের সুর বলিয়া জানিবে ও যে সুরের নীচে কসি চিহ্ন দেখিবে তাহা নীচের সুর বলিয়া জানিবে।

সা — গা — গা — গা —   ম — ম — পা — পা —
শ ত শ ত   শ ত দ ল

$\overline{\text{সা}}$ — $\overline{\text{সা}}$ — $\overline{\text{সা}}$ — $\overline{\text{সা}}$ নী — নী — পা — পা
বি ক শি ত   চ ল চ ল

পা — ধা — পা — ম —   গা —   — গা — গা —
মৃ দু মৃ দু   গু উ [illegible] রে

গা — ম — পা — ম —   গা — রে — সা — $\underline{\text{নী}}$ —
অ লি কু ল   চ ঞ ঞ্চ ল

উপরের গানে চরণের ভাগগুলিতে চিহ্ন দেওয়া নাই, কিন্তু চিহ্ন দেওয়া আবশ্যক। কোন একটী পুস্তকের প্রবন্ধে যদি দাঁড়ি, কমা প্রভৃতি কোন ছেদ চিহ্ন দেওয়া না থাকে তাহা হইলে যেমন পাঠের অসুবিধা হয়, সেইরূপ চরণের মধ্যে মধ্যে ছেদ চিহ্ন না থাকিলে গানের অসুবিধা হয়। এক-একটী তাল যে কয়টী মাত্রা অধিকার করিয়া থাকিবে, সেই কয়েকটী-মাত্রার পরে একটী-করিয়া দাঁড়ি দেওয়া যাইবে, এবং যেখানে চরণের শেষ হইবে সেখানে দুইটী দাঁড়ি দেওয়া যাইবে। ইহার উদাহরণ—

সা — গা — গা — গা — । ম — ম — পা — পা — । $\overline{\text{সা}}$ — $\overline{\text{সা}}$ — $\overline{\text{সা}}$ — $\overline{\text{সা}}$ — । নী — নী — পা — পা — ॥
শ ত শ ত   শ ত দ ল   বি ক শি ত   চ ল চ ল।

পা—ধা—পা—ম—। গা— —গা—গা—। গা—ম—পা—ম—। গা—রে—সা—নী॥
মু হু মু হু গু উ ঞ্জ রে অ লি কু ল চ ঞ্চ ল॥

উপরের গানের ভাগ গুলির প্রথম সুর গুলির মাথায় তালের অর্থাৎ ঝোঁকের চিহ্ন দেওয়া হইবে, তাহার সংকেত এই।—ফাঁক তালের চিহ্ন—০ শূন্য। প্রথম তাল ১। দ্বিতীয় তাল ২। তৃতীয় তাল ৩।

উদাহরণ।

০ ১ ২ ৩
গা—গা—গা—গা—। মা—ম—পা—পা—। সা—সা—সা—সা। নী—নী—পা—পা—॥
শ ত শ ত শ ত দ ল বি ক শি ত চ ল চ ল।
০ ১ ২ ৩
পা—ধা—পা—ম—। গা—গা—গা—গা—। গা—ম—পা—ম—। গা—রে—সা—নী—॥
মু হু মু হু গু উ ঞ্জ রে অ লি কু ল চ ঞ্চ ল॥

কোমল ও কড়ি সুরের সংকেত।

রে সুর কোমল হইলে রে না লিখিয়া রি লিখিতে হইবে। গা সুর কোমল হইলে "গা" না লিখিয়া সেই স্থলে গ লেখা যাইবে। ধা সুর কোমল হইলে ধা না লিখিয়া ধ লিখিতে হইবে; নী কোমল হইলে দীর্ঘ নী'র পরিবর্ত্তে নি লিখিতে হইবে।

ম সুর কড়ি হইলে "ম" না লিখিয়া মা লিখিতে হইবে। নিম্নে কড়ি কোমল সুর সমেত একটি গানের এক চরণ দেওয়া গেল।

০ ১ ২ ৩
রি—গা—ধা—মা—। গা—রি—সা—সা—। নী—সা—গা—গা—। রি—গা—পা—পা॥
শ ত শ ত শ ত দ ল বি ক সি ত চ ল চ ল

উপরে রে'র পরিবর্ত্তে রি লেখা হইয়াছে—ইহার অর্থ কোমল রে, এবং ম'র পরিবর্ত্তে মা লেখা হইয়াছে ইহার অর্থ কড়ি ম।

নীচে যে গানটী প্রকাশ করিতেছি তাহার তাল খেম্‌টা। খেম্‌টা তালে চারিটী করিয়া তাল থাকে এবং প্রত্যেক তাল তিনটী করিয়া মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে।

পাঠকেরা উহাতে তাল ও কড়ি কোমলের সংকেতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিবেন।

গান।

রাগিণী পিলু। তাল খেম্‌টা।

০ ১ ২ ৩ ০
সা— — নী—। সা—নী—সা—। রে—গ— —। রে— — —। রে—পা —।
ব ল গো লা প মো রে বল্‌ ফু ট

LITHO BY H.C.Haldar.

গান।

রাগিনী পিলু। তাল খেমটা।

বল্, গোলাপ, মোরে বল্,
তুই ফুটিবি সখি কবে?
ফুল ফুটেছে চারি পাশ,
চাঁদ হাসিছে সুধা-হাস,
বায়ু ফেলিছে মৃদু-শ্বাস,
পাখী গাহিছে মধু রবে।
তুই ফুটিবি সখি কবে?
প্রাতে পড়েছে শিশির-কণা,
সাঁঝে বহিছে দখিনা বায়,

কাছে ফুলবালা সারি সারি
দূরে পাতার আড়ালে সাঁঝের তারা
মুখানি দেখিতে চায়।
বায়ু দূর হতে আসিয়াছে,
যত ভ্রমর ফিরিছে কাছে,
কচি কিশলয় গুলি
রয়েছে নয়ন তুলি,
তারা সুধাইছে মিলি সবে
তুই ফুটিবি সখি কবে॥

মুকুট।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ত্রিপুরার রাজা অমর মাণিক্যের কনিষ্ঠ পুত্র রাজধর সেনাপতি ইশা খাঁকে বলিলেন—"দেখ সেনাপতি, আমি বারবার বলিতেছি তুমি আমাকে অসম্মান করিও না।"

পাঠান ইশা খাঁ কতকগুলি তীরের ফলা লইয়া তাহাদের ধার পরীক্ষা করিতেছিলেন। রাজধরের কথা শুনিয়া কিছুই বলিলেন না, কেবল মুখ তুলিয়া ভুরু উঠাইয়া একবার তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। আবার তখনি মুখ নত করিয়া তীরের ফলার দিকে মনোযোগ দিলেন।

রাজধর বলিলেন—"ভবিষ্যতে যদি তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাক তবে আমি তাহার সমুচিত প্রতিবিধান করিব।"

বৃদ্ধ ইশা খাঁ সহসা মাথা তুলিয়া বজ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বটে!"

রাজধর তাঁহার তলোয়ারের খাপের আগা মেঝের পাথরের উপরে ঠক করিয়া ঠুকিয়া বলিলেন "হাঁ!"

ইশা খাঁ বালক জয়ধরের বুক-ফুলানর ভঙ্গী ও তলোয়ারের আস্ফালন দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না—হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। জয়ধরের সমস্ত মুখ, চোখের শাদাটা পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল।

ইশা খাঁ উপহাসের স্বরে হাসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিলেন "মহামহিম মহারাজাধিরাজকে কি বলিয়া ডাকিতে হইবে? হুজুর, জনাব, জাঁহাপনা, শাহেন্ শা—"

রাজধর তাঁহার স্বাভাবিক কর্কশ স্বর দ্বিগুণ কর্কশ করিয়া কহিলেন—"আমি তোমার ছাত্র বটে, কিন্তু আমি রাজকুমার—তাহা তোমার মনে নাই!"

ইশা খাঁ তীব্রস্বরে কহিলেন—"বস্! চুপ্! আর অধিক কথা কহিও না! আমার অন্য কাজ আছে।" বলিয়া পুনরায় তীরের ফলার প্রতি মন দিলেন।

এমন সময় ত্রিপুরার দ্বিতীয় রাজপুত্র ইন্দ্রকুমার তাঁহার দীর্ঘপ্রস্থ বিপুল বলিষ্ঠ দেহ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। মাথা হেলাইয়া হাসিয়া বলিলেন "খাঁ সাহেব, আজিকার ব্যাপারটা কি!"

ইন্দ্রকুমারের কণ্ঠ শুনিয়া বৃদ্ধ ইশা খাঁ তীরের ফলা রাখিয়া সস্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন—হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"শোন ত বাবা, বড় তামাসার কথা! তোমার

এই কনিষ্টটিকে—মহারাজ চক্রবর্ত্তীকে জাঁহাপনা জনাব বলিয়া না ডাকিলে উহাঁর অপমান বোধ হয়!" বলিয়া আবার তীরের ফলা লইয়া পড়িলেন।

"সত্য না কি!" বলিয়া ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

রাজধর বিষম ক্রোধে বলিলেন—"চুপ্ কর দাদা!"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন—"রাজধর, তোমাকে কি বলিয়া ডাকিতে হইবে?' জাঁহাপনা! হা হা হা হা!"

রাজধর কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন—"দাদা, চুপ কর বলিতেছি।"

ইন্দ্রকুমার আবার হাসিয়া বলিলেন—"জনাব!"

রাজধর অধীর হইয়া বলিলেন "দাদা তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ!"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া রাজধরের পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন—"ঠাণ্ডা হও ভাই, ঠাণ্ডা হও। তোমার বুদ্ধি তোমার থাক্! আমি তোমার বুদ্ধি কাড়িয়া লইতেছি না!"

ঈশা খাঁ কাজ করিতে করিতে আড়চোখে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"উহাঁর বুদ্ধি সম্প্রতি অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন "নাগাল পাওয়া যায় না।"

রাজধর গস্‌গস্ করিয়া চলিয়া গেলেন। চলনের দাপে খাপের মধ্যে তলোয়ার-খানা ঝন্‌ঝন্ করিতে লাগিল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজকুমার রাজধরের বয়স উনিশ বৎসর। শ্যামবর্ণ, বেঁটে, দেহের গঠন বলিষ্ঠ। সেকালে অন্য রাজপুত্রেরা যেমন বড় বড় চুল রাখিতেন ইহাঁর তেমন ছিলনা। ইহাঁর সোজা সোজা মোটা চুল ছোট করিয়া ছাঁটা। ছোট ছোট চোখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। দাঁত গুলি কিছু বড়। গলার আওয়াজ ছেলেবেলা হইতেই কেমন কর্কশ। রাজধরের বুদ্ধি অত্যন্ত বেশী এইরূপ সকলের বিশ্বাস, তাঁহার নিজের বিশ্বাসও তাই। এই বুদ্ধির বলে তিনি আপনার দুই দাদাকে অত্যন্ত হেয়জ্ঞান করিতেন। রাজধরের প্রবল প্রতাপে বাড়িশুদ্ধ সকলে অস্থির। আবশ্যক থাক্ না থাক্ একখানা তলোয়ার মাটিতে ঠুকিয়া ঠুকিয়া তিনি বাড়িময় কর্ত্তৃত্ব করিয়া বেড়ান। রাজবাটির চাকর বাকরেরা তাঁহাকে রাজা বলিয়া মহারাজ বলিয়া হাতযোড় করিয়া সেলাম করিয়া প্রণাম করিয়া কিছুতে নিস্তার পায় না। সকল জিনিষেই তাঁহার হাত, সকল জিনিষই তিনি নিজে দখল করিতে চান। সে বিষয়ে তাঁহার চক্ষুলজ্জাটুকু পর্য্যন্ত নাই। একবার যুবরাজ চন্দ্রনারায়ণের একটা ঘোড়া তিনি রীতিমত দখল করিয়াছিলেন, দেখিয়া যুবরাজ ঈষৎ হাসিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। আর একবার কুমার ইন্দ্রকুমারের রূপার পাত লাগান একটা ধনুক অম্লান বদনে অধিকার করিয়া ছিলেন—ইন্দ্রকুমার

চটিয়া বলিলেন—“দেখ যে জিনিষ লইয়াছ, উহা আমি আর ফিরাইয়া লইতে চাহি না, কিন্তু ফের যদি তুমি আমার জিনিষে হাত দাও, তবে আমি এমন করিয়া দিব যে, ও হাতে আর জিনিষ তুলিতে পারিবে না।” কিন্তু রাজধর দাদাদের কথা বড় গ্রাহ্য করিতেন না। লোকে তাঁহার আচরণ দেখিয়া আড়ালে বলিত “ছোট কুমারের রাজার ঘরে জন্ম বটে, কিন্তু রাজার ছেলের মত কিছুই দেখিনা।”

কিন্তু মহারাজা অমরমাণিক্য রাজধরকে কিছু বেশী ভাল বাসিতেন। রাজধর তাহা জানিতেন। আজ পিতার কাছে গিয়া ইষাখাঁর নামে নালিশ করিলেন।

রাজা ইষা খাঁকে ডাকাইয়া আনিলেন। বলিলেন—“সেনাপতি, রাজকুমারদের এখন বয়স হইয়াছে। এখন উঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান করা উচিত।”

“মহারাজ বাল্যকালে যখন আমার কাছে যুদ্ধ শিক্ষা করিতেন তখন মহারাজকে যেরূপ সম্মান করিতাম রাজকুমারগণকে তাহা অপেক্ষা কম সম্মান করি না।”

রাজধর বলিলেন “আমার অনুরোধ তুমি আমার নাম ধরিয়া ডাকিওনা।

ইষা খাঁ বিদ্যুৎবেগে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন—“চুপ কর বৎস! আমি তোমার পিতার সহিত কথা কহিতেছি। মহারাজ, মার্জনা করিবেন আপনার এ কনিষ্ঠ পুত্রটি রাজ পরিবারের উপযুক্ত হয় নাই। ইহার হাতে তলোয়ার শোভা পায় না। এ বড় হইলে মুন্সির মত কলম চালাইতে পারিবে—আর কোন কাজে লাগিবেনা।”

এমন সময়ে চন্দ্রনারায়ণ ও ইন্দ্রকুমার সেখানে উপস্থিত হইলেন। ইষা খাঁ তাঁহাদিগের দিকে ফিরিয়া বলিলেন “চাহিয়া দেখুন্ মহারাজ এই ত যুবরাজ বটে! এইত রাজপুত্র বটে!”

রাজা রাজধরের দিকে চাহিয়া বলিলেন—“রাজধর, খাঁ সাহেব কি বলিতেছেন? তুমি অস্ত্রবিদ্যায় উঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পার নাই?”

রাজধর বলিলেন, “মহারাজ, আমাদের ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা গ্রহণ করুন, পরীক্ষায় যদি আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হই তবে আমাকে পরিত্যাগ করিবেন! আমি রাজবাটি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।”

রাজা বলিলেন “আচ্ছা, আগামী সপ্তাহে পরীক্ষা হইবে। তোমাদের মধ্যে যিনি উত্তীর্ণ হইবেন তাঁহাকে আমার হীরক-খচিত তলোয়ার পুরস্কার দিব।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রকুমার ধনুর্বিদ্যায় অসাধারণ ছিলেন। শুনা যায় একবার তাঁহার এক অনুচর প্রাসাদের ছাদের উপর হইতে একটা মোহর নীচে ফেলিয়া দেয়, সেই মোহর মাটিতে পড়িতে না পড়িতে তীর মারিয়া কুমার তাহাকে শত হাত দূরে ফেলিয়াছিলেন। রাজধর রাগের মাথায় পিতার সম্মুখে দম্ভ করিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু

মনের ভিতরে বড় ভাবনা পড়িয়া গেল। যুবরাজ চন্দ্রনারায়ণের জন্য বড় ভাবনা নাই—তীর-ছোঁড়া বিদ্যা তাঁহার ভাল আসিত না। কিন্তু ইন্দ্রকুমারের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা দায়। রাজধর অনেক ভাবিয়া অবশেষে একটা ফন্দী ঠাওরাইলেন। হাসিয়া মনে মনে বলিলেন—"তীর ছুঁড়িতে পারি না পারি আমার বুদ্ধি তীরের মত—তাহাতে সকল লক্ষ্যই ভেদ হয়।"

কাল পরীক্ষার দিন। যে জায়গাতে পরীক্ষা হইবে, যুবরাজ, ইষা খাঁ ও ইন্দ্রকুমার সেই জমি তদারক করিতে গিয়াছেন। রাজধর আসিয়া বলিলেন—"দাদা, আজ পূর্ণিমা আছে—আজ রাত্রে যখন বাঘ গোমতী নদীতে জল খাইতে আসিবে তখন নদীতীরে বাঘ শিকার করিতে গেলে হয় না?"

ইন্দ্রকুমার আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন "কি আশ্চর্য্য! রাজধরের যে আজ শিকারে প্রবৃত্তি হইল? এমন ত কখন দেখা যায় না!"

ইষা খাঁ রাজধরের প্রতি ঘৃণার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন—"উনি আবার শিকারী নন, উনি জাল পাতিয়া ঘরের মধ্যে শিকার করেন। উঁহার বড় ভয়ানক শিকার। রাজসভায় একটি জীব নাই যে উঁহার ফাঁদে একবার-না-একবার না পড়িয়াছে!"

চন্দ্রনারায়ণ দেখিলেন কথাটা রাজধরের মনে লাগিয়াছে—ব্যথিত হইয়া বলিলেন—"সেনাপতি সাহেব, তোমার তলোয়ারও যেমন তোমার কথাও তেমনি, উভয়ই শাণিত—যাহার উপরে গিয়া পড়ে, তাহার মর্ম্মচ্ছেদ করে।"

রাজধর হাসিয়া বলিলেন "না দাদা, আমার জন্য বেশী ভাবিও না। খাঁ-সাহেব অনেক শাণ দিয়া কথা কহেন বটে কিন্তু আমার কানের মধ্যে পালকের মত প্রবেশ করে।"

ইষা খাঁ হঠাৎ চটিয়া উঠিয়া পাকা গোঁফে চাড়া দিয়া বলিলেন—"তোমার কান আছে না কি? তা যদি থাকিত তাহা হইলে এতদিনে তোমাকে সিধা করিতে পারিতাম।" বৃদ্ধ ইষা খাঁ কাহাকেও বড় মান্য করিত না।

ইন্দ্রকুমার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। চন্দ্রনারায়ণ গম্ভীর হইয়া রহিলেন, কিছু বলিলেন না। যুবরাজ বিরক্ত হইয়াছেন বুঝিয়া ইন্দ্রনারায়ণ তৎক্ষণাৎ হাসি থামাইয়া তাঁহার কাছে গেলেন—মৃদুভাবে বলিলেন—"দাদা তোমার কি মত? আজ রাত্রে শিকার করিতে যাইবে কি?

চন্দ্রনারায়ণ কহিলেন—"তোমার সঙ্গে ভাই শিকার করিতে যাওয়া মিথ্যা, তাহা হইলে নিতান্ত নিরামিষ শিকার করিতে হয়। তুমি বনে গিয়া যত জন্তু মারিয়া আন, আর আমরা কেবল লাউ-কুমড়া কচু কাঁঠাল শিকার করিয়া আনি!"

ইষাখাঁ পরম হৃষ্ট হইয়া হাসিতে লাগিলেন—সস্নেহে ইন্দ্রকুমারের পিঠ চাপড়াইয়া

বলিলেন—"যুবরাজ ঠিক কথা বলিতেছেন পুত্র! তোমার তীর সকলের আগে গিয়া ছোটে এবং নির্ঘাত-গিয়া লাগে। তোমার সঙ্গে কে পারিয়া উঠিবে!"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন—"না না দাদা, ঠাট্টা নয়—যাইতে হইবে। তুমি না গেলে কে শিকার করিতে যাইবে?"

যুবরাজ বলিলেন "আচ্ছা চল। আজ রাজধরের শিকারের ইচ্ছা হইয়াছে উঁহাকে নিরাশ করিব না!"

সহাস্য ইন্দ্রকুমার চকিতের মধ্যে ম্লান হইয়া বলিলেন—"কেন দাদা, আমার ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়া কি যাইতে নাই!"

চন্দ্রনারায়ণ বলিলেন—"সে কি কথা ভাই, তোমার সঙ্গে ত রোজই শিকারে যাইতেছি—"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন—"তাই সেটা পুরাতন হইয়া গেছে!"

চন্দ্রনারায়ণ বিমর্ষ হইয়া বলিলেন—"তুমি আমার কথা এমন করিয়া ভুল বুঝিলে বড় ব্যথা লাগে!"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন—"না দাদা, আমি ঠাট্টা করিতেছিলাম। শিকারে যাইব না ত কি! চল তার আয়োজন করিগে!"

ঈষাখাঁ মনে মনে কহিলেন—"ইন্দ্রকুমার বুকে দশটা বাণ সহিতে পারে, কিন্তু দাদার একটু সামান্য অনাদর সহিতে পারে না!"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শিকারের বন্দোবস্ত সমস্ত স্থির হইলে পরে রাজধর আস্তে আস্তে ইন্দ্রকুমারের স্ত্রী কমলাদেবীর কক্ষে গিয়া উপস্থিত। কমলাদেবী হাসিয়া বলিলেন "এ কি ঠাকুরপো! একেবারে তীরধনুক বর্ম্মচর্ম্ম লইয়া যে! আমাকে মারিবে না কি?"

রাজধর বলিলেন—"ঠাকুরাণী, আমরা আজ তিন ভাই শিকার করিতে যাইব তাই এই বেশ!"

কমলাদেবী আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"তিন ভাই! তুমিও যাইবে না কি! আজ তিন ভাই একত্র হইবে! এ ত ভাল লক্ষণ নয়! এ যে ত্র্যহস্পর্শ হইল?"

যেন বড় ঠাট্টা হইল এই ভাবে রাজধর হাহা করিয়া হাসিলেন কিন্তু বিশেষ কিছু বলিলেন না।

কমলাদেবী কহিলেন—"না না, তাহা হইবে না—রোজরোজ শিকার করিতে যাইবেন আর আমি ঘরে বসিয়া ভাবিয়া মরি!"

রাজধর বলিলেন—"আজ আবার রাত্রে শিকার!"

কমলাদেবী মাথা-নাড়িয়া বলিলেন—"সে কখনই হইবে না। দেখিব আজ কেমন করিয়া যান্।"

রাজধর বলিলেন—"ঠাকুরাণী এক কাজ কর—ধনুকবাণগুলি লুকাইয়া রাখ!"

কমলাদেবী কহিলেন—"কোথায় লুকাইব?"

রাজধর—"আমার কাছে দাও, আমি লুকাইয়া রাখিব।"

কমলাদেবী হাসিয়া কহিলেন "মন্দকথা নয়। সে বড় রঙ্গ হইবে।" কিন্তু মনে মনে বলিলেন "তোমার একটা কি মৎলব আছে! তুমি যে কেবল আমার উপকার করিতে আসিয়াছ তাহা বোধ হয় না।"

"এস অস্ত্রশালায় এস" বলিয়া কমলাদেবী রাজধরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। চাবি লইয়া ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালার দ্বার খুলিয়া দিলেন। রাজধর যেমন ভিতরে প্রবেশ করিলেন অমনি কমলাদেবী দ্বারে তালা লাগাইয়া দিলেন, রাজধর ঘরের মধ্যে বন্ধ হইয়া রহিলেন। কমলাদেবী বাহির হইতে হাসিয়া বলিলেন "ঠাকুরপো, আমি তবে আজ আসি।" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

এদিকে সন্ধ্যার সময় ইন্দ্রকুমার অন্তঃপুরে আসিয়া অস্ত্রশালার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাইতেছেন না। কমলাদেবী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"হাঁগা, আমাকে খুঁজিতেছ বুঝি, আমিত হারাই নাই!" শিকারের সময় বহিয়া যায় দেখিয়া ইন্দ্রকুমার দ্বিগুণ ব্যস্ত হইয়া খোঁজ-করিতে লাগিলেন। কমলাদেবী তাঁহাকে বাধা দিয়া আবার তাঁহার মুখের কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন—হাসিতে হাসিতে বলিলেন—হাঁগা, দেখিতে কি পাও না? চোখের সম্মুখে তবু ঘরময় বেড়াইতেছ?" ইন্দ্রকুমার কিঞ্চিৎ কাতরস্বরে কহিলেন—"দেবি, এখন বাধা দিও না—আমার একটা বড় আবশ্যকের জিনিষ হারাইয়াছে।"

কমলা কহিলেন—"আমি জানি তোমার কি হারাইয়াছে। আমার একটা কথা যদি রাখ ত খুঁজিয়া দিতে পারি।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন—"আচ্ছা রাখিব।"

কমলাদেবী বলিলেন—"তবে শোন। আজ তুমি শিকার করিতে যাইতে পারিবে না। এই লও তোমার চাবি।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন—"সে হয় না—এ কথা রাখিতে পারি না।"

কমলাদেবী বলিলেন "চন্দ্রবংশে জন্মিয়া এই বুঝি তোমার আচরণ! একটা সামান্য প্রতিজ্ঞা রাখিতে পার না!"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন "আচ্ছা, তোমার কথাই রহিল। আজ আমি শিকারে যাইব না।"

কমলাদেবী—"তোমাদের আর কিছু হারাইয়াছে? মনে করিয়া দেখ দেখি!"

ইন্দ্রকুমার—"কই, মনে পড়ে না ত!"

কমলাদেবী—"তোমাদের সাত-রাজার-ধন মাণিক! তোমাদের সোনার চাঁদ?"

ইন্দ্রকুমার মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন। কমলাদেবী কহিলেন "তবে এস, দেখ'সে!" বলিয়া অস্ত্রশালার দ্বারে গিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। কুমার দেখিলেন রাজধর ঘরের মেঝেতে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন—দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন—"এ কি, রাজধর অস্ত্রশালায় যে!"

কমলাদেবী বলিলেন—"উনি আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন "তা বটে, উনি সকল অস্ত্রের চেয়ে তীক্ষ্ণ।"

রাজধর মনে মনে বলিলেন—"তোমাদের তিরস্কার-চেয়ে নয়।" রাজধর ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলেন।

তখন কমলাদেবী গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"না কুমার, তুমি শীকার করিতে যাও। আমি তোমার সত্য ফিরাইয়া লইলাম।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন—"শীকার করিব? আচ্ছা।" বলিয়া ধনুকে তীর যোজনা করিয়া অতি ধীরে কমলাদেবীর দিকে নিক্ষেপ করিলেন। তীর তাঁহার পায়ের কাছে পড়িয়া গেল—কুমার বলিলেন "আমার লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল!"

কমলাদেবী বলিলেন—"না, পরিহাস না। তুমি শীকারে যাও।"

ইন্দ্রকুমার কিছু বলিলেন না। ধনুর্ব্বাণ ঘরের মধ্যে ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। যুবরাজকে বলিলেন—"দাদা,আজ শীকারের সুবিধা হইল না। চন্দ্রনারায়ণ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"বুঝিয়াছি!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আজ পরীক্ষার দিন। রাজবাটির বাহিরের মাঠে বিস্তর লোক জড় হইয়াছে। রাজার ছত্র ও সিংহাসন প্রভাতের আলোতে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। জায়গাটা পাহাড়ে, উঁচুনীচু—লোকে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে যেন মানুষের মাথার ঢেউ উঠিয়াছে। ছেলেগুলো গাছের উপর চড়িয়া বসিয়াছে। একটা ছেলে গাছের ডাল হইতে আস্তে আস্তে হাত বাড়াইয়া একজন মোটা-মানুষের মাথা-হইতে পাগ্‌ড়ী তুলিয়া আরেকজনের মাথায় পরাইয়া দিয়াছে। যাহার পাগ্‌ড়ি সে ব্যক্তি চটিয়া ছেলেটাকে গ্রেফ্‌তার করিবার জন্য নিষ্ফল প্রয়াস পাইতেছে, অবশেষে নিরাশ হইয়া সজোরে গাছের ডাল নাড়া দিতেছে, ছোঁড়াটা মুখভঙ্গী করিয়া ডালের উপর বাঁদরের মত নাচিতেছে। মোটা-মানুষের দুর্দ্দশা ও রাগ দেখিয়া সে দিকে একটা হো হো হাসি পড়িয়া গিয়াছে। একজন এক হাঁড়ি দই মাথায় করিয়া বাড়ি যাইতেছিল, পথে জনতা দেখিয়া সে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল—হঠাৎ দেখে তাহার মাথায় হাঁড়ি নাই, হাঁড়িটা মুহূর্ত্তের মধ্যে হাতে হাতে কতদূর চলিয়া গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই—দইওয়ালা খানিকক্ষণ হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

একজন বলিল—"ভাই, তুমি দইয়ের বদলে ঘোল খাইয়া গেলে, কিঞ্চিৎ লোকসান হইল বৈত নয়!" দইওয়ালা পরম সান্ত্বনা পাইয়া গেল। হারু নাপিতের পরে গাঁ-সুদ্ধ লোক চটা ছিল। তাহাকে ভিড়ের মধ্যে দেখিয়া লোকে তাহার নামে ছড়া কাটিতে লাগিল। সে যত খেপিতে লাগিল খেপাইবার দল তত বাড়িয়া উঠিল—চারিদিকে চটাপট্ হাত-তালি পড়িতে লাগিল। আটার প্রকার আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল। সে ব্যক্তি মুখ চক্ষু লাল করিয়া চটিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া, চাদর ভূমিতে লুটাইয়া, একপাটি চটিজুতা ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া বিশ্বের লোককে অভিশাপ দিতে দিতে বাড়ি ফিরিয়া গেল। ঠাসা-ঠাসি ভিড়ের মাঝে মাঝে একেক্‌টা ছোট ছেলে আত্মীয়ের কাঁধের উপর চড়িয়া কান্না জুড়িয়া দিয়াছে। এমন কত জায়গায় কত কলরব উঠিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। হঠাৎ নহবৎ বাজিয়া উঠিল। সমস্ত কোলাহল ভাসাইয়া দিয়া জয় জয় শব্দে আকাশ প্লাবিত হইয়া গেল। কোলের ছেলে যতগুলা ছিল ভয়ে সমস্বরে কাঁদিয়া উঠিল—গাঁয়ে গাঁয়ে পাড়ায় পাড়ায় কুকুর গুলো উর্দ্ধমুখ হইয়া ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। পাখী যেখানে যত ছিল ভয়ে গাছের ডাল ছাড়িয়া আকাশে উড়িল। কেবল গোটাকতক বুদ্ধিমান কাক সুদূরে গাম্ভারী গাছের ডালে বসিয়া দক্ষিণে ও বামে ঘাড় হেলাইয়া একাগ্র-চিত্তে অনেক বিবেচনা করিতে লাগিল এবং একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ অসন্দিগ্ধচিত্তে কা কা করিয়া ডাকিয়া উঠিতে লাগিল। রাজা আসিয়া সিংহাসনে বসিয়া-ছেন। পাত্রমিত্র সভাসদ্‌গণ আসিয়াছেন। রাজকুমারগণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে আসিয়াছেন। নিশান লইয়া নিশানধারী আসিয়াছে। ভাট আসিয়াছে। সৈন্যগণ পশ্চাতে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়াছে। বাজন্দারগণ মাথা নাড়াইয়া নাচিয়া সবলে পরমোৎসাহে ঢোল পিটাইতেছে। মহা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। পরীক্ষার সময় যখন হইল, ঈষা খাঁ রাজকুমার-গণকে প্রস্তুত হইতে কহিলেন। ইন্দ্রকুমার যুবরাজকে কহিলেন—"দাদা, আজ তোমাকে জিতিতে হইবে, তাহা না হইলে চলিবে না!"

যুবরাজ হাসিয়া বলিলেন—"চলিবে না ত কি! আমার একটা ক্ষুদ্র তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেও জগৎসংসার যেমন চলিতেছিল তেম্‌নি চলিবে। আর যদিই বা না চলিত তবু আমার জিতিবার ত কোন সম্ভাবনা দেখিতেছি না।"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন—"দাদা তুমি যদি হার ত আমিও ইচ্ছাপূর্ব্বক লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব!"

যুবরাজ ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া কহিলেন—"না ভাই, ছেলেমানুষী করিও না—ওস্তাদের নাম রক্ষা করিতে হইবে!"

রাজধর বিবর্ণ শুষ্ক চিন্তাকুল মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঈষা খাঁ আসিয়া কহিলেন—"যুবরাজ, সময় হইয়াছে, ধনুক গ্রহণ কর।"

যুবরাজ দেবতার নাম করিয়া ধনুক গ্রহণ করিলেন। প্রায় দুই শ হাত দূরে গোটাপাঁচছয় কলাগাছের গুঁড়ি একত্র বাঁধিয়া স্থাপিত হইয়াছে। মাঝে একটা কচুর

পাতা চোখের মত করিয়া বসান আছে। তাহারি ঠিক মাঝখানে চোখের তারার আকারে কালো চিহ্ন অঙ্কিত। সেই চিহ্নই লক্ষ্যস্থল। দর্শকেরা অর্দ্ধচন্দ্র আকারে মাঠ ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে—যেদিকে লক্ষ্য স্থাপিত সেদিকে যাওয়া নিষেধ।

যুবরাজ ধনুকে বাণ যোজনা করিলেন। লক্ষ্যস্থির করিলেন। বাণনিক্ষেপ করিলেন। বাণ লক্ষ্যের উপর দিয়া চলিয়া গেল। ইষাখাঁ তাহার গোঁফ-সুদ্ধ দাড়ি-সুদ্ধ মুখ বিকৃত করিল—পাকা ভুরু কুঞ্চিত করিল। কিন্তু কিছু বলিল না। ইন্দ্রকুমার বিষণ্ণ হইয়া এমন ভাব ধারণ করিলেন, যেন তাঁহাকেই লজ্জিত করিবার জন্ম দাদা ইচ্ছা করিয়া এই কীর্ত্তিটি করিলেন। অস্থির ভাবে ধনুক নাড়িতে নাড়িতে ইষাখাঁকে বলিলেন—"দাদা মন দিলেই সমস্ত পারেন কিন্তু কিছুতেই মন দেন না।"

ইষা খাঁ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তোমার দাদার বুদ্ধি আর সকল জায়গাতেই খেলে কেবল তীরের আগায় খেলে না, তাহার কারণ, বুদ্ধি তেমন সূক্ষ্ম নয়।"

ইন্দ্রকুমার ভারি চটিয়া একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন। ইষা খাঁ বুঝিতে পারিয়া দ্রুত সরিয়া গিয়া রাজধরকে বলিলেন—"কুমার, এবার তুমি লক্ষ্য ভেদ কর মহারাজা দেখুন।"

রাজধর বলিলেন—"আগে দাদার হউক্!"

ইষা খাঁ রুষ্ট হইয়া কহিলেন—"এখন উত্তর করিবার সময় নয়। আমার আদেশ পালন কর।"

রাজধর চটিলেন, কিন্তু কিছু বলিলেন না। ধনুর্ব্বাণ তুলিয়া লইলেন। লক্ষ্য স্থির করিয়া নিক্ষেপ করিলেন; তীর মাটিতে বিদ্ধ হইল। যুবরাজ রাজধরকে কহিলেন "তোমার বাণ অনেকটা নিকটে গিয়াছে—আর একটু হইলেই লক্ষ্য বিদ্ধ হইত।"

রাজধর অম্লানবদনে কহিলেন—"লক্ষ্য ত বিদ্ধ হইয়াছে দূর হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না!"

যুবরাজ কহিলেন "না রাজধর তোমার দৃষ্টির ভ্রম হইয়াছে, লক্ষ্য বিদ্ধ হয় নাই।"

রাজধর কহিলেন—"হাঁ, বিদ্ধ হইয়াছে। কাছে গেলেই দেখা যাইবে।" যুবরাজ আর কিছু বলিলেন না।

অবশেষে ইষা খাঁর আদেশ ক্রমে ইন্দ্রকুমার নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে ধনুক তুলিয়া লইলেন। যুবরাজ তাঁহার কাছে গিয়া কাতরস্বরে কহিলেন "ভাই, আমি অক্ষম—আমার উপর রাগ করা অন্যায়—তুমি যদি আর লক্ষ্য ভেদ করিতে না পার তবে তোমার ভ্রষ্টলক্ষ্য-তীর আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিবে, ইহা নিশ্চয় জানিও।"

ইন্দ্রকুমার যুবরাজের পদধূলি লইয়া কহিলেন—"দাদা, তোমার আশীর্ব্বাদে আজ লক্ষ্য ভেদ করিব, ইহার অন্যথা হইবে না।"

ইন্দ্রকুমার তীর নিক্ষেপ করিলেন, লক্ষ্য বিদ্ধ হইল। বাজনা বাজিল। চারিদিকে

জয়ধ্বনি উঠিল। যুবরাজ যখন ইন্দ্রকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন, আনন্দে ইন্দ্রকুমারের চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। ইষা খাঁ পরম স্নেহে কহিলেন—"পুত্র আল্লার কৃপায় তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া থাক।"

মহারাজা যখন ইন্দ্রকুমারকে পুরস্কার দিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে রাজধর গিয়া কহিলেন—"মহারাজ আপনাদের ভ্রম হইয়াছে। আমার তীর লক্ষ্যভেদ করিয়াছে!"

মহারাজ কহিলেন—"কখনই না!"

রাজধর কহিলেন—"মহারাজ কাছে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন!"

সকলে লক্ষ্যের কাছে গেলেন। দেখিলেন যে-তীর মাটিতে বিদ্ধ তাহার ফলায় ইন্দ্রকুমারের নাম খোদিত—আর যে-তীর লক্ষ্যে বিদ্ধ তাহাতে রাজধরের নাম খোদিত। রাজধর কহিলেন "বিচার করুন মহারাজ।"

ইষা খাঁ কহিলেন "নিশ্চয় তূণ বদল হইয়াছে!"

কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল তূণ বদল হয় নাই। সকলে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন।

ইষা খাঁ কহিলেন "পুনর্ব্বার পরীক্ষা করা হউক্!"

রাজধর বিষম অভিমান করিয়া কহিলেন—"তাহাতে আমি সম্মত হইতে পারি না! আমার প্রতি এ বড় অন্যায় অবিশ্বাস! আমি ত পুরস্কার চাই না। মধ্যম কুমার বাহাদুরকে পুরস্কার দেওয়া হউক্"—বলিয়া পুরস্কারের তলোয়ার ইন্দ্রকুমারের দিকে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

ইন্দ্রকুমার দারুণ ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন—"ধিক্! তোমার হাত হইতে এ পুরস্কার গ্রাহ্য করে কে! এ তুমি লও"—বলিয়া তলোয়ার খানা ঝন্‌ঝন্ করিয়া রাজধরের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। রাজধর হাসিয়া নমস্কার করিয়া তাহা তুলিয়া লইলেন।

তখন ইন্দ্রকুমার কম্পিতস্বরে পিতাকে কহিলেন "মহারাজ, আরাকানপতির সহিত শীঘ্র যুদ্ধ হইবে। সেই যুদ্ধে গিয়া আমি পুরস্কার আনিব। মহারাজ আদেশ করুন!"

ইষা খাঁ ইন্দ্রকুমারের হাত ধরিয়া কঠোর স্বরে কহিলেন "তুমি আজ মহারাজের অপমান করিয়াছ। উঁহার তলোয়ার লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছ। ইহার সমুচিত শাস্তি আবশ্যক।"

ইন্দ্রকুমার সবলে হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন—"বৃদ্ধ, আমাকে স্পর্শ করিও না!"

বৃদ্ধ ইষা খাঁ সহসা বিষণ্ণ হইয়া রুদ্ধস্বরে কহিলেন—"পুত্র, এ কি পুত্র! আমার পরে এই ব্যবহার! তুমি আজ আত্মবিস্মৃত হইয়াছ বৎস!"

ইন্দ্রকুমারের চোখে জল উথলিয়া উঠিল—তিনি কহিলেন "সেনাপতি সাহেব, আমাকে মাপ কর, আমি আজ যথার্থই আত্মবিস্মৃত হইয়াছি!"

যুবরাজ স্নেহের স্বরে কহিলেন "শান্ত হও ভাই—গৃহে ফিরিয়া চল।"

ইন্দ্রকুমার পিতার পদধূলি লইয়া কহিলেন, "পিতা অপরাধ মার্জ্জনা করুন!" গৃহে ফিরিবার সময় যুবরাজকে কহিলেন "দাদা আজ আমার যথার্থই পরাজয় হইয়াছে!"

রাজধর যে কেমন করিয়া জিতিলেন তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না।

ক্রমশঃ।

ব্যায়াম।

ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবার দিকে খুবই একটা ঝোঁক হইয়াছে। ছেলেদের মা বাপের ওদিকে যেমন ঝোঁক ছেলেদেরও তেমনি। যাহাদের বড় দুঃখের দশা তাহারাও একবেলা না খাইয়া পয়সা বাঁচাইয়া প্রাণপণে ছেলেদের লেখাপড়া শেখার খরচ যোগাইতেছে। এমন অনেক ছেলে আছে যাহারা নিজে নিজে ভিক্ষা করিয়া কিম্বা চাকুরি করিয়া, একহাতে ভাতের কাটি আর একহাতে বই ধরিয়া লেখাপড়া শিখিতেছে। ইহা আমাদের মনকে আনন্দ ও আশায় পরিপূরিত করিয়া দেয়। বিদ্যাশিক্ষাতে যে অশেষ উপকার পাওয়া যায়, অশেষ উন্নতির পথ মুক্ত হয় তাহা বোধগম্য হইয়াছে বলিয়াই সকলেরি ঐদিকে এত ঝোঁক অতএব ও সম্বন্ধে আর কিছু বলা বাহুল্য। এখন শরীরের উন্নতির সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কেননা ওদিকে কি মা বাপের কি ছেলেদের নিজের কাহারই বড় একটা মনোযোগ দেখিতে পাওয়া যায় না। পড়া মুখস্থ করাতে ছেলের কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখিলে মা বাপ উভয়েই মহা ধম্‌কাধম্‌কি আরম্ভ করেন কিন্তু ছেলের শরীর যথোচিতরূপে বর্দ্ধিত, বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হইতেছে কি না সে বিষয়ে কাহারও খেয়ালই হয় না। যে পর্য্যন্ত ছেলে রোগে একেবারে শয্যাগত হইয়া না পড়ে সে পর্য্যন্ত ছেলের শরীরের প্রতি মাতাপিতার দৃষ্টি পড়ে না। শরীরটা অকিঞ্চিৎকর পদার্থ এই মনে করিয়া যদি তাহার প্রতি এতাদৃশ তাচ্ছল্য প্রকাশ করা হয় তাহা হইলে নিদেন পক্ষে মনের খাতিরেও তো তাহার প্রতি একটু মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। এ পৃথিবীতে শরীরের সহায়তা ব্যতিরেকে মন কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয় না। শরীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, যেমন খাদ্যাদি পরিপাকের প্রধান যন্ত্র উদর, রক্ত চলাচলের প্রধান যন্ত্র হৃৎপিণ্ড, সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তির প্রধান যন্ত্র মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক সতেজ থাকিলে মানসিক বৃত্তি সকলও সতেজ থাকে আর মস্তিষ্ক ক্ষীণবল হইলে মানসিক বৃত্তিসকলও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ন্যায় মস্তিষ্কও রক্তদ্বারা পোষিত হয়। যে কোন কারণে স্বাস্থ্যের হানি হইলে রক্তের বলকারিতা কমিয়া যায় কাজেই মস্তিষ্কও ক্ষীণবল হইয়া যায়। স্কুলের

বাঙ্গালী বালকেরা কিম্বা সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার্থী বাঙ্গালী যুবকেরা বিদ্যার পরীক্ষায় তাহাদের ইংরাজ প্রতিদ্বন্দীর সমকক্ষ হইয়া থাকেন কিন্তু প্রৌঢ় বয়সে কার্য্যক্ষেত্রে ইংরাজ বাঙ্গালীতে কি আকাশ পাতাল প্রভেদ দেখা যায়। ইংরাজের বাল্যকালের কল্পনা, আশা, উৎসাহ বিদ্যাশিক্ষাদ্বারা পরিপক্ক ও দৃঢ় হইলে তার পরে তিনি যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তখন তাঁহার দ্বারা কোন্ মহান কার্য্য না সাধিত হয়! তখন তিনি যে পথে যাইতে মনস্থ করেন তাহার সম্মুখে যদি অটল অচলও আসিয়া বাধা দেয় তিনি তাঁহার অনন্ত উদ্যম ও অপ্রতিহত বুদ্ধিবলে তাহা কাটিয়া ফেলিয়া সেই পথে স্বেচ্ছানুসারে অগ্রসর হন, (তার সাক্ষী ঘরঘাট ও ভলঘাটের শৈল-সুরঙ্গ) যদি কোন প্রবল বেগবতী নদী আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করে তিনি তাহার নীচে সুরঙ্গ খনন করিয়া আপনার পথ প্রস্তুত করিয়া লন, (তার সাক্ষী টেমস্ টানেল) তিনি রাবণেরও অধিক প্রতাপে অগ্নি, বায়ু, বরুণ, বিদ্যুৎকে চিরস্থায়ী রূপে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া তাহাদের দ্বারা সহস্র সহস্র কাজ করাইয়া লন (তাহার প্রমাণ তোমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছ)। তিনি তাঁর অতুল কৃষি ও বাণিজ্য কৌশলে অল্পকালের মধ্যে মরুভূমিকে ফল পুষ্প জলে সুশোভিত করিয়া তোলেন। পুরাকালে দেবগণ বা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ঋষি তপস্বি কর্ত্তৃক যে অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সকল সমাধা হইত বলিয়া শোনা যায় একালের ইংরাজ দ্বারা তার চেয়ে কিছুই কম হয় না। কর্ম্ম- ক্ষেত্রেই ইংরাজ জীবনের মধ্যাহ্ন তেজ দীপ্তিমান দেখা যায়। বাঙ্গালী জীবনের তেজাগ্নি স্কুল-দিবার মধ্যাহ্নে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে আর স্কুল দিবা অবসানে অমনি হুশ্ করিয়া নিবিয়া যায়। বাঙ্গালী প্রৌঢ় বয়সে কর্ম্মক্ষেত্রে রুগ্ন ভগ্ন অতি দীনহীন ক্ষীণ ভাবে কোন প্রকারে দিন কাটান, তাঁর গম্য পথের সামনে যদি কুটাগাছটা পড়িয়া থাকে তাহা হইলে তিনি অমনি ধীরে অন্য একটি পথ অবলম্বন করেন। ইংরাজ, বাঙ্গালী জীবনের একসময়ে সমকক্ষ থাকিয়া তৎপরে তাঁহাদের মধ্যে যে এতাদৃশ বৈষম্য জন্মায় ইহার কারণ কি? আমার তো বোধ হয় বাঙ্গালীর শারীরিক দুর্ব্বলতাই ইহার প্রধান কারণ। স্বাস্থ্যের নিয়ম সকলের প্রতি বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ ঔদাস্যই এই দুর্ব্বলতার মূল। শরীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্তে পুষ্টিকর এবং বলকর খাদ্য, বিশুদ্ধ জল বাতাস ও ব্যায়াম এই কয়টি অত্যাবশ্যক। ইহার কোনটিই সচরাচর বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটে না। অন্য সকল জাতির সচরাচর আহারীয় বস্তুর তুলনায় বাঙ্গালীর সচরাচর আহারীয় বস্তু ভাতের বলকারক গুণ অতি অল্প। সৌভাগ্য ক্রমে কলিকাতায় কলের জল আসিয়া আজকাল এখানে জলের দোষ অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। লোকপূর্ণ বড় বড় সহরে বিশুদ্ধ বাতাস বড়ই দুষ্প্রাপ্য, তাহাতে আবার অধিকাংশ বাঙ্গালীর গলি ঘুঁজির মধ্যে বাস, সে সব স্থানে যে বাতাস টুকু যায় বাড়ির ভিতরে ও বাহিরে নানারকমের দুর্গন্ধময় জিনিসপত্র জমা হইতে দিয়া সে বাতাসটুকুকেও যেন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যতদূর সম্ভব হানিজনক করিয়া

তোলা হয়। ব্যায়াম চর্চ্চা বাঙ্গালীর মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। কোন প্রকার শ্রমজনক কাজের প্রতি আমাদের স্বভাবতই একটা বিরাগের ভাব আছে। আমরা শুইতে পাইলে বসিতে চাহি না, বসিতে পাইলে দাঁড়াইতে চাহি না, দাঁড়াইতে পাইলে চলিতে চাহি না, ঘরে থাকিতে পাইলে বাহিরে যাইতে চাহি না। ইংরাজদের ঠিক বিপরীত, ঘুম না পাইলে তাঁহারা কখনই শুইয়া থাকিতে পারেন না, অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হইলে তাঁদের বড়ই কষ্ট বোধ হয়, নিজের কোন কাজ হাতে না থাকিলে তাঁরা উৎসুক হইয়া আগ্রহের সহিত পরের পাঁচটা কাজ করিয়া দিয়া আসেন, দিনের মধ্যে নিদেন পক্ষে দুইবার বাহিরে বেড়াইয়া, হাওয়া খাইয়া না আসিতে পারিলে তাঁদের জীবন যাত্রা অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠে, বৃষ্টি বাদ্লাদিতে ঘরের বাহিরে যাওয়াতে নিতান্ত বাধা পড়িলে ঘরের ভিতরে থাকিয়া যতদূর সম্ভব লাফালাফি ছুটাছুটি করিয়া যাহাতে ভাল রূপে রক্ত চলাচল ও শরীর প্রতিষ্ঠ বলিষ্ঠ হইতে পারে সে জন্যে তাঁরা দিন দিন নূতন নূতন খেলা ধূলা আবিষ্কার করিতেছেন। ইংরাজ বালকদের শরীর ও মন দুইই যাহাতে সুন্দর রূপে বর্দ্ধিত ও বলিষ্ঠ হইতে পারে তজ্জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে, তাহাদের কি বাহিরের কি ঘরের প্রায় সকল প্রকার খেলাই শ্রমজনক, তাহাদের সকল স্কুলেই ব্যায়াম চর্চ্চার আয়োজন থাকে। শুদ্ধ বালকেরা কেন যুবারা, বৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত ঘোড়ায় চড়া, হাঁটিয়া বেড়ান, ব্যাড্‌মিন্টন্ খেলা, ক্রিকেট খেলা, পোলো খেলা এইরূপ কোন-না-কোন প্রকার শ্রমজনক কাজ নিয়মিত প্রতিদিন দুইবেলা করিয়া থাকেন। আর সুযোগ পাইলেই বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে কখনই ত্রুটি করেন না। যাঁহার হাতে রাশি রাশি গুরুতর কার্য্যের ভার সমর্পিত রহিয়াছে, যিনি দিনরাত্রের প্রত্যেক সেকেণ্ড গণিয়া গণিয়া কার্য্যের সময় বিভাগ করেন তিনিও তাঁর নিয়মিত দৈনিক ব্যায়ামের ও বায়ু সেবনের ত্রুটি করেন না, তিনি বরং আরও অধিকতর মনোযোগের সহিত স্বাস্থ্যের নিয়ম সকল পালন করেন, কেননা তিনি ইহা বিলক্ষণ জানেন যে স্বাস্থ্য না থাকিলে কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। যাঁহার হাতে যত গুরুতর কার্য্যের ভার সমর্পিত তাঁহার তত অধিক পরিমাণে স্বাস্থ্যের প্রয়োজন কেননা তাঁহার স্বাস্থ্যের উপরে শুধু তাঁর নিজের নয় হয়ত সমস্ত দেশের লোকের শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে। রাণী ভিক্টোরিয়ার প্রধান মন্ত্রী গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ সাহেব, যাঁহার বয়স এখন আশি বৎসর, যাঁহার স্কন্ধে রাণীর ইংলণ্ড, স্কট্‌লণ্ড, আয়র্লণ্ড, আমেরিকা, আফ্রিকা, আসিয়া ব্যাপি এই সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের সমস্ত ভার এখন চাপান রহিয়াছে সেই অলৌকিক প্রতিভা সম্পন্ন গ্ল্যাড্‌ষ্টোন সাহেব এই অতি বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার মস্তিষ্কের বলে যেমন দক্ষতার সহিত এই সুবিস্তৃত রাজ্যের অগণ্য অগণ্য প্রকারের কার্য্য সকল সমাধা করিতেছেন তাঁহার বাহুবলেও তেমনি সুদক্ষতার সহিত বৃক্ষকুলে দৈত্যবৎ ওক্‌গাছ সকলকে ভূমিশায়ী করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে যদি বা কোন ব্যক্তি গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ সাহেবের বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকেন

তিনি বৃহৎ রাজ্য চালান দূরে থাকুক নিজের হস্তপদাদিকে চালাইতে সম্পূর্ণ অক্ষম হইয়া পড়েন। ইংরাজেরা স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করেন বলিয়াই বাল্যকালে তাঁদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি একত্রে বর্দ্ধিত ও বলিষ্ঠ হয়, যৌবনকালে কার্য্যক্ষেত্রে এই দুই শক্তির সহায়তাতে তাঁহারা এত আর এমন সব মহৎ মহৎ কার্য্য সুসিদ্ধ করিতে সক্ষম হন, আর সেই জন্যেই বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত তাঁদের এই শক্তি স্থায়ী হয়। বৃদ্ধ ইংরাজ পাকা আমটির মত। বৃদ্ধ বাঙ্গালী একটা শুষ্ক পত্র। আমাদের দেশের কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তি যদি কোন গুরুতর মানসিক শ্রমজনক কার্য্যে অধ্যবসায়ের সহিত কিছু কাল পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকেন তাহা হইলে তিনি উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া হয় অকালে পরলোক গমন করেন নয়তো চিররোগা হইয়া জীবন যাপন করেন। আমাদের শরীর সুস্থ ও সবল রাখিতে না পারিলে আমরা কখনই কর্ম্মক্ষম হইতে পারিব না। বাল্যকালেই শরীর মন গঠিত হইবার সময়, এই সময়ে যত্ন ও অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা পাইলে শরীর ও মনকে অনেক পরিমাণে ইচ্ছানুরূপে গঠিত করা যাইতে পারে। এই জন্যে আমরা বালকদিগকে ও তাদের মাতা পিতাকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা যেন পক্ষপাত শূন্য হইয়া শরীর ও মন উভয়েরই উন্নতির প্রতি সমান রূপে মনোনিবেশ করেন। বালকের স্বাস্থ্যের জন্যে কি প্রকার খাদ্য অধিক উপযোগী সে সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা আছে। উপস্থিত প্রবন্ধে ব্যায়াম সম্বন্ধে লেখা যাইতেছে। যে-সব বালকদের বালক-স্বভাব-সুলভ দৌড়াদৌড়ি খেলা ধূলার কোন প্রকার ব্যাঘাত ঘটে না তাহাদের ব্যায়াম চর্চ্চার তেমন প্রয়োজন করে না। সহরবাসী যে সমস্ত স্কুলের বালকদের স্থান বা সময়ের অভাব প্রযুক্ত দৌড়াদৌড়ির সুবিধা হয় না বা অনভ্যাস-বশত ইচ্ছাও হয় না তাঁহাদের পক্ষে রীতিমত প্রতিদিন দুইবেলা ব্যায়াম করা অত্যাবশ্যক। বালকেরা তাঁহাদের লেখা পড়ার কার্য্য হইতে যে টুকু সময় কাড়িয়া লইয়া ব্যায়ামে নিযুক্ত করিবেন সে টুকুতে তাঁদের লেখা পড়ার কোন ক্ষতি হওয়া দূরে থাকুক বরং আরও দ্বিগুণ লাভ বোধ হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগামী ও কর্ম্মিষ্ঠ মার্কিন্ জাতীয় এক ব্যক্তি এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন বালকদের প্রতীতির জন্যে এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। "ফিলাডেল্ফিয়ার যে স্কুলে আমি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলাম সেখানকার পড়িবার সমস্ত ঘর একিই তলাতে, সমস্ত ঘরের মধ্যে এমন দেয়াল দেওয়া যে ইচ্ছা করিলে সে সমস্ত দেয়াল পাশের দিকে সরাইয়া দিয়া সকল ঘরগুলিকে একটা ঘরের মত করিয়া ফেলা যায়। হেড্মাষ্টার সঙ্কেত করিলেই, দিনের মধ্যে দুইবার, দুই প্রহরে ও বিকালে, ঘরের মধ্যেকার দেয়াল সরাইয়া দেওয়া হইত, বালকেরা অমনি দেয়ালের কাছে গিয়া সেখানে যে সমস্ত লাঠি সাজান থাকিত প্রত্যেকে এক এক গাছা হাতে করিয়া ঘরের মাঝখানে আসিয়া সার গাঁথিয়া দাঁড়াইত। একজন শিক্ষক পিয়ানোর কাছে গিয়া একটা ছোট খাট সাদাসিদে সুর বাজাইতেন আর বালকেরা সেই

তালে তালে লাঠি দিয়া ব্যায়াম করিত। দিনে দুইবার পাঁচ দশ মিনিট করিয়া এই প্রকার ব্যায়াম করিবার পর আমাদের এমন চমৎকার স্ফূর্ত্তি হইত, আমরা যেন নূতন বল পাইয়া আবার পড়িতে বসিতাম। অনেক সময়ে দুপর বেলার দিকে কেমন ক্লান্ত বোধ হইত আর ঘুম পাইত তখন এই প্রকার ব্যায়ামেতে আমাদের জাগাইয়া দিয়া একেবারে তাজা করিয়া তুলিত। ইহাতে স্কুলের পড়ার কোন হানি না হইয়া বরং সম্পূর্ণ সহায়তা করিত। ঘণ্টা বাজিলে অমনি যে যাহার লাঠি যথাস্থানে রাখিয়া নিজের নিজের পড়া আরম্ভ করিত, আবার এমনি সুনিয়মে কাজ চলিত যেন মাঝখানে কোন বাধাই পড়েনি।" ইঁহার বর্ণিত "লাঠির ব্যায়াম"-এর কথাই এবার লেখা যাইতেছে। প্রথমেই এই ব্যায়াম আরম্ভ করিবার সুবিধা এই যে, ইহা দ্বারা শরীরের গাঁঠ ও মাংসপেশী সকলকে ইচ্ছামত দিকে নোয়াইবার ও ফিরাইবার ক্ষমতা বাড়ে, এই জন্যে ইহা বালকদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কাহারও যদি কুঁজো হইয়া চলিবার অভ্যাস কিম্বা বুক সরু থাকে এই ব্যায়ামে তাহা শোধ্‌রাইয়া যাইতে পারে। ইহাতে বড় অধিক পরিশ্রম হয় না একারণেও ইহা আরম্ভের পক্ষে ভাল, কেননা ব্যায়াম করিয়া খুব ক্লান্ত হইয়া পড়িলে তাহাতে উপকার না হইয়া আরও অধিক অপকার হইবারই সম্ভব। যে টুকু শ্রমেতে শরীরে বেশ স্ফূর্ত্তি বোধ হয় সেইটুকু শ্রমই স্বাস্থ্যকারক। খোলা বাতাসে ব্যায়াম করিলে ব্যায়ামের ফল আরও অধিক হয়। লাঠির ব্যায়ামের নিয়ম এই—লাঠিগাছটি বেশ সোজা, চাঁচা ছোলা আর এক ইঞ্চি আন্দাজ মোটা হওয়া চাই, ছোট ছোট ছেলেদের জন্যে দুই হাত লম্বা, বড়দের জন্যে আড়াই হাত।
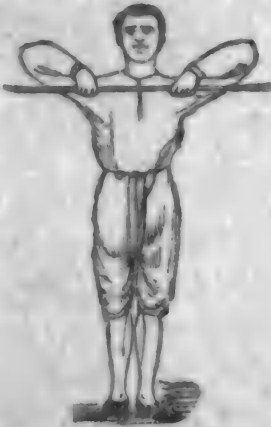
১। ১ম চিত্রে যেমন দেখিতেছ ঐ রকমে দুই হাত দিয়া লাঠি-গাছা তিন ভাগ করিয়া ধর। ঐ ভাবে হাত সজোরে নীচে নামাইয়া পায়ের কাছাকাছি রাখ, আবার দাড়ির নীচে পর্য্যন্ত উঠাও, হাতের কনুই যেন উপরের দিকে থাকে, ছবিতে যেমন দেখিতেছ।

২। ১ চিত্রে যেরকমে লাঠি ধরা হইয়াছে ঐ রকমে ধরিয়া যথাসাধ্য উচ্চে উঠাও, দশবার এইরূপ করিবে।

৩। অগেকার মত লাঠি ধরিয়া যথাসাধ্য উচ্চে উঠাইয়া ঘাড়ের নীচে নামাইয়া আন, যেমন ২য় চিত্রে দেখিতেছ। এইরূপ দশবার করিবে।

১ম চিত্র।

৪। আগেকার মত লাঠি ধারিয়া খুব জোরে যথাসাধ্য উচ্চে উঠাইয়া নামাইবার সময় একবার ঘাড়ের নীচে নামাইবে আর একবার দাড়ির নীচে নামাইবে।

৫। এবার লাঠির দুইধার দুই হাতে ধরিয়া (৩য় চিত্রে যেমন দেখিতেছ) যথাসাধ্য উচ্চে উঠাও আর পিঠের দিকে যথাসাধ্য নীচে নামাও (৪র্থ চিত্রে যেমন দেখিতেছ), দেখো যেন হাত ঠিক সোজা থাকে, কুনুই দোমড়াইয়া না যায়। এইরূপ ঘুড়িবার করিবে।

৬। আগেকার মত দুইধার দুইহাতে ধরিয়া লাঠি উচ্চে উঠাও আর নামাইবার সময়ে একবার সাম্‌নের দিকে নামাও

২য় চিত্র।

আর একবার পিঠের দিকে নামাও।

৭। লাঠির দুই ধার দুই হাতে ধরিয়া মাথার উপরে উঠাও, তার পরে ৫ম চিত্রে যেমন দেখিতেছ ঐ রকমে একবার বাঁদিকে ফিরাও আর একবার ডান্‌দিকে ফিরাও। দেখো যেন কুনুই দোম্‌ড়াইয়া না যায় আর লাঠি যেন খাড়া থাকে।

৩য় চিত্র।
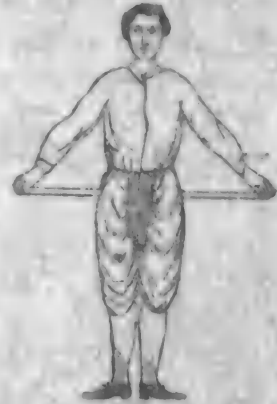
৪র্থ চিত্র।

৮। লাঠির মাঝখানে পাঁচ ছয় ইঞ্চি দূরে, দুই হাত দিয়া ধরিয়া হাত যথাসাধ্য সোজা রাখিয়া সামনের দিকে বাড়াইয়া দেও; তারপরে হাত আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়া যতদূরে সম্ভব একপাশ হইতে আর একপাশে ঘুরাও।

৯। ডানহাতে লাঠির মাথা ধরিয়া, দুই পায়ের দুই গোড়ালি একত্র করিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াও; ঐরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া যত দূরে পার তেড়াভাবে লাঠি বাড়াইয়া

দেও, লাঠির তলাটা ছুঁয়ে থাকিবে, লাঠি ও শরীর দু-ইই যেন ঠিক খাড়া থাকে। তারপরে ৬ষ্ঠ চিত্রে যেমন দেখিতেছ ঐভাবে পা বাড়াইয়া দেও, পা লাঠির পশ্চাৎদিকে পড়িবে। এইরূপ করিবার সময়ে কুনুই যেন দোমড়াইয়া না যায় আর লাঠি যেন না নড়ে। ইহাতে কাঁধও প্রায় নড়েনা, কেবল পায়ের দিকটা নড়ে চড়ে। এই রকম ভাবে একবার ডান্ পা বাড়াইবে আর একবার বাঁ পা বাড়াইবে; দশবার এইরূপ করিবে।

১০। খাড়া হইয়া দাঁড়াও; লাঠির মাথা বাঁ হাতে ধরিয়া তেড়াভাবে সামনের দিকে যতদূরে পার বাড়াইয়া দেও, তার পরে লাঠির দিকে বাঁ পা বাড়াইয়া দেও। বাঁ পা ঠিক ঐ অবস্থায় রাখিয়া ডান্পা একবার যতদূরে সাধ্য বাড়াইয়া দিবে (যেমন ৭ম চিত্রে দেখিতেছ) আবার টানিয়া লইবে। ঐরূপ করিবার সময় ডানপায়ের হাঁটু যেন দোমড়াইয়া না যায় আর মাথা ও কাঁধের ঝোঁক যেন পশ্চাৎদিকে থাকে।

৫ম চিত্র।

১১। ৮ম চিত্রে যেমন দেখিতেছ ঐ প্রকারে লাঠি ধরিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাত সোজা ভাবে সাম্নের দিকে ছুঁড়িয়া দেও আবার বুকের দিকে টানিয়া লও। লাঠি যেন সর্বক্ষণ ঠিক খাড়া থাকে। দশবার এইরূপ করিবে।

১২। শেষোক্ত প্রকার ব্যায়ামের মত করিয়া সাম্নের দিকে হাত ছুঁড়িয়া দিয়া (৯ চিত্রে যেমন দেখিতেছ) ঐ ভাবে ডান্পাশে আনিয়া ধরিবে। আবার সাম্নের দিকে হাত ছুঁড়িয়া দিয়া ঐ ভাবে বাঁপাশে আনিয়া ধরিবে। দশবার এইরূপ করিবে।

৬ষ্ঠ চিত্র।

১৩। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সাম্নের দিকে হাত ছুঁড়িয়া দিয়া ৮ম চিত্রের মত ভাবে বুকের কাছে ধর। তারপরে তেড়াভাবে বাঁদিকে উচ্চে উঠাও (১০ম চিত্রে যেমন দেখিতেছ)। আবার বুকের কাছে ধরিয়া ১০ম চিত্রের মত তেড়াভাবে ডানদিকে বাড়াইয়া দেও। এইরূপে একবার এ-পাশে একবার ও-পাশে করিয়া কুড়িবার করিবে।

১৪। শেষোক্ত ব্যায়ামের মত লাঠি ডানদিকে বাড়াইবে ও সেই সঙ্গে ডান পাও সেই দিকে বাড়াইবে। পা ও লাঠি দুই তেড়াভাবে বাড়াইবে, (১১শ চিত্রে যমন দেখিতেছ) একবার বাঁ দিকে একবার ডান-দিকে এইরূপ কুড়িবার করিবে।

১৫। শেষোক্ত প্রকারে লাঠি যখন বাঁদিকে বাড়াইবে তখন সেই সঙ্গেডান পা

৭ম চিত্র।

ডানদিকে বাড়াইবে। আবার লাঠি যখন ডানদিকে বাড়াইবে তখন সেই সঙ্গে বাঁ পা বাঁদিকে বাড়াইবে।

১৬। ডান্ পা তেড়াভাবে সাম্‌নের দিকে বাড়াইবে আর সেই সঙ্গে লাঠি তেড়াভাবে বাঁ কাঁধের উপর দিয়া পিঠের দিকে বাড়াইবে, আবার বাঁ-পা ঐ ভাবে বাড়াইবে ও সেই সঙ্গে লাঠি ডান কাঁধের উপর দিয়া ঐ ভাবে বাড়াইবে।

১৭। ডান পা তেড়াভাবে পশ্চাৎ দিকে বাড়াইবে আর সেই সঙ্গে লাঠি তেড়াভাবে সাম্‌নের দিকে বাঁয়ে বাড়াইবে, ১২শ চিত্রে যেমন দেখিতেছ। বাঁ পা যখন পশ্চাৎ দিকে বাড়াইবে তখন লাঠি সাম্‌নের দিকে ডাইনে বাড়াইবে।

১৮। ডান পা তেড়াভাবে পশ্চাৎ দিকে বাড়াইবে আর সেই সঙ্গে লাঠি তেড়াভাবে পশ্চাৎ দিকে ডাইনে বাড়াইবে। আবার বাঁ পা তেড়াভাবে পশ্চাৎ দিকে বাড়াইবে আর সেই সঙ্গে লাঠি তেড়াভাবে পশ্চাৎদিকে বাঁয়ে বাড়াইবে।

৮ম চিত্র।

১৯। শেষোক্ত ভাবে পা ও লাঠি বাড়াইবে, কেবল যখন ডান পা বাড়াইবে তখন লাঠি বাঁয়ে বাড়াইবে, আর যখন বাঁ পা বাড়াইবে তখন লাঠি ডাইনে বাড়াইবে।

এই ব্যায়াম সকল তালে তালে করিলে বড় ভাল হয়। বালকেরা এক গাছা লাঠি অনায়াসেই সংগ্রহ করিতে পারেন, এ ব্যায়াম এমন সহজ যে ইহা অভ্যাস পক্ষে তাহা-দের কোন প্রতিবন্ধক ঘটবার কোন্ সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

তাঁহার রাজবাটির সম্মুখে একদল লোক জমা হইয়াছে। বাটির বাহিরে আসিয়া দেখিলেন একদল ছেলে। কি, ব্যাপারটা কি? রাজার নিকট একটি নিবেদন আছে। রাজার সহিসের ছেলে ডানেকর, পায়ে জুতা নাই, গায়ে ময়লা কাপড়—সে অগ্রসর হইয়া আপনাদের প্রার্থনা রাজাকে জানাইল। রাজার একটি স্কুল আছে, কেবল তাঁহার সেপাইরা সেই স্কুলে পড়ে। সম্প্রতি শুনা গেছে রাজা নিয়ম করিয়াছেন অন্য ছেলেরাও সেখানে পড়িতে পাইবে তাই শুনিয়া রাজার সেই স্কুলে ভর্ত্তি হইবার জন্য ইহারা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে।

সহিসের ছেলে ডানেকর ছবি আঁকিতে বড় ভালবাসিত। সে মাটিতে দেয়ালে যেখানে পাইত খড়ি দিয়া নানা রকম ছবি আঁকিত। সে জানিত রাজার স্কুলে ছবি আঁকা শিখান' হয়। তাই যখন সে শুনিল রাজার স্কুলে সকলেই যাইতে পারে তখন ভারি খুসী হইয়া সেই স্কুলে ভর্ত্তি হইবার জন্য বাপের কাছে প্রস্তাব করে। বাপ চটিয়া গরম হইয়া উঠিল—বলিল "তুমি নিজের কাজে মন দাওত বাপু। লেখাপড়া শিখিতে হইবে না!" এই বলিয়া তাহাকে মারিয়া ঘরে চাবিবন্ধ করিয়া রাখিল। ডানেকর জানলার মধ্য দিয়া পলাইয়া আপনার সমবয়সী একদল ছোট ছেলে জুটাইয়া স্বয়ং রাজার দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া ডানেকরকে স্কুলে পাঠাইতে রাজি হইলেন। ডানেকরের বাপ দেখিল ছেলে স্কুলে গেলে আস্তাবলের কাজের কিছু অসুবিধা হইবে—ভারি বিরক্ত হইয়া মারধোর করিয়া ছেলেকে বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিল। কিন্তু ছেলের মা গুটিকতক গায়ের কাপড় পুঁটুলিতে বাঁধিয়া তাহার সঙ্গে দিলেন—এবং খানিক রাস্তা তাহার সঙ্গে গিয়া ছেলের কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

ডানেকর গরীব—এই জন্য স্কুলে তাহাকে কেহ গ্রাহ্য করিত না। সেখানে তাহাকে উঠান ঝাঁট দিতে হইত, চাকরের কাজ করিতে হইত। বোধ করি যত্ন করিয়া তাহাকে কেহ শিখাইত না—অনেক সময়ে ডানেকর লুকাইয়া গোপনে শিক্ষা করিত। স্কুলে ছবি-আঁকা শেখা ফুরাইলে পর, আরো বেশী করিয়া শিখিবার জন্য ডানেকর পায়ে হাঁটিয়া দেশে বিদেশে ভ্রমণ করেন। এমনি করিয়া প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর কাটিয়া গেল।

এখন এই ডানেকরের নাম য়ুরোপে সকল জায়গায় বিখ্যাত। ডানেকরের মত পাথরের মূর্ত্তি গড়িতে কয়জন লোক পারে! যে রাজার স্কুলে তিনি পড়িতে অনুমতি পাইয়াছিলেন, সেই রাজার নাম আজ আর বড় কাহারও মনে পড়ে না কিন্তু সেই রাজার একজন সহিসের ছেলের নাম য়ুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্র হইতেছে!

৩

মাড়োয়ারের রাজপুত রাজা যশোবন্ত দিল্লির বাদশা আরঙ্গজেবের একজন সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার অধীনে নহর খাঁ নামক এক হিন্দু রাজপুত বীর ছিলেন। নহর খাঁ

বলিয়া তাঁহাকে সকলে ডাকিত বটে কিন্তু তাঁহার আসল নাম ছিল মুকুন্দদাস। এক সময়ে তিনি বাদশাকে অমান্য করাতে বাদশা তাঁহার উপর চটিয়া যান। বাদশা হুকুম দিলেন—"কোন প্রকার অস্ত্র না লইয়া মুকুন্দকে একটা বাঘের খাঁচার মধ্যে গিয়া বাঘের সঙ্গে লড়াই করিতে হইবে।" মুকুন্দ বলিলেন "আচ্ছা তাহাই হইবে।" নির্ভয়ে খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি বাঘকে ডাকিয়া বলিলেন—"ওহে তুমিত মিঞা সাহেবের বাঘ, একবার যশোবন্তের বাঘের কাছে এস দেখি!" এই বলিয়া চোখ রাঙাইয়া তিনি বাঘের দিকে চাহিলেন। হঠাৎ কি কারণে বাঘের এমনি ভয় হইল যে, সে মুখ ফিরাইয়া লেজ গুটাইয়া গুড়্‌গুড় করিয়া কোণে চলিয়া গেল। রাজপুত বীর কহিলেন, "যে-শত্রু ভয়ে পালায় তাহাকে ত আমরা মারিতে পারি না। তাহা আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ।" এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া বাদশা তাঁহাকে পুরস্কার দিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

বাঘেরা অত্যন্ত ভয়ানক জানোয়ার বটে কিন্তু এক এক সময়ে তাহারা হঠাৎ অত্যন্ত সামান্য কারণে কেমন ভয় পায়। একটা গল্প বোধ করি তোমরা সকলে শুনিয়া থাকিবে—একদল ইংরাজ সুন্দরবনে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। যখন আহারের সময় হইল, বনের মধ্যে আসন পাতিয়া সকলে আহারে বসিয়া গেলেন। এমন সময়ে জঙ্গলের ভিতর হইতে একটা বাঘ লাফ দিয়া তাঁহাদের কাছে আসিয়া পড়িল। বাঘ দেখিয়া একটি মেম সাহেব তাড়াতাড়ি ছাতা খুলিয়া তাহার মুখের সামনে ধরিলেন। হঠাৎ অদ্ভুত একটা ছাতা-খোলার ব্যাপার দেখিয়া বাঘের এমনি ভয় লাগিল যে সেখানে অধিকক্ষণ থাকা সে ভাল বোধ করিল না, চটপট ঘরে ফিরিয়া গেল। এমন শোনা যায় বাঘের চোকের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিলে বাঘ আক্রমণ করিতে সাহস করে না। এটা লোকের মুখে শোনা কথা। কথাটার সত্য মিথ্যা ঠিক বলিতে পারি না। নিজে পরখ করিয়া যে বলিব এমন সুবিধাও নাই সাধও নাই। পরখ করিতে গেলে ফিরিয়া আসিয়া বলিবার অবকাশ না থাকিতে পারে।

নহর খাঁর আরেকটা গল্প বলি। রাজপুতদের একপ্রকার খেলা আছে। ঘোড়ায় চড়িয়া একটা গাছের নীচে দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিতে হয়। ঘোড়া যখন ছুটিতেছে তখন গাছের ডাল ধরিয়া ঝুলিতে হয়, ঘোড়া পায়ের নীচে দিয়া চলিয়া যায়। বাদশাহের এক ছেলে একবার নহর খাঁকে এই খেলা খেলিতে হুকুম করেন। নহর রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন "আমি ত আর বাঁদর নই। রাজা যদি খেলা দেখিতে ইচ্ছা করেন ত লড়াই করিতে হুকুম দিন একবার তলোয়ারের খেলাটা দেখাইয়া দিই।" বাদশার পুত্র বলিলেন—"আচ্ছা, তুমি সৈন্য লইয়া সিরোহির রাজা সুরতানকে ধরিয়া লইয়া আইস।" নহর রাজি হইলেন। সিরোহীর রাজা অচলগড় নামক তাঁর এক পর্ব্বতের দুর্গের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। নহর বাছা-বাছা এক দল লোক লইয়া গভীর রাত্রে গোপনে দুর্গের মধ্যে গিয়া রাজাকে নিজের পাগড়ির কাপড়ে বাঁধিয়া ফেলিলেন। রাজাকে এইরূপে বন্দী

করিয়া নহর তাঁহাকে দিল্লীতে নিজের প্রভু যশোবন্ত সিংহের নিকটে আনিয়া দিলেন। যশোবন্ত সুরতানকে বাদশার সভায় লইয়া যাইবেন স্থির করিলেন এবং সেই সঙ্গে কথা দিলেন যে বাদশাহের সভায় কেহ তাঁহাকে কোনরূপ অপমান করিতে পারিবে না। সিরোহীর রাজাকে আরঞ্জীবের সভায় লইয়া যাওয়া হইল। দস্তুর আছে যে বাদসাহের সভায় গেলে বাদশাহকে সকলেরই নত হইয়া সেলাম করিতে হয়। সেই দস্তুর অনুসারে সকলে সুরতানকে সেলাম করিতে বলিল। তিনি সদর্পে মাথা তুলিয়া বলিলেন—"আমার প্রাণ বাদ্শাহের হাতে—কিন্তু আমার মান আমার নিজের হাতে! কখন কোন মানুষের কাছে মাথা নোয়াই নাই কখন নোয়াইব না।" সভার লোকেরা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু যশোবন্তের প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কেহ তাঁহাকে কিছু বলিল না। তাহারা একটা কৌশল করিল। একটি ছোট দরজার মত ছিল তাহার মধ্য দিয়া গলিতে হইলে মাথা নিচু না করিলে চলে না—সেই দরজার ভিতর দিয়া তাঁহাকে বাদশাহের সম্মুখে যাইতে বলিল। কিন্তু পাছে মাথা হেঁট হয় বলিয়া তিনি আগে পা গলাইয়া দিয়া মাথা বাহির করিয়া আনিলেন। বাদশাহ রাজার এই নির্ভীকতায় রাগ না করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তুমি কোন্ রাজ্য পুরস্কার চাও, আমি দিব!" রাজা তৎক্ষণাৎ বলিলেন "আমার অচলগড়ের মত রাজ্য আর কোথায় আছে, সেইখানেই আমাকে ফিরিয়া যাইতে দিন।" বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাই অনুমতি করিলেন। এই রাজা এবং রাজবংশ চিরদিন আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। কখনই মোগল সম্রাটদের দাস হন নাই। যিনি বন্দী অবস্থাতেও নিজের মান রাখিয়া চলিতে পারেন তাঁহাকে দমন করিতে পারে কে?

আশ্চর্য্য পলায়ন।

রুষিয়ার অবস্থা এখন অতি ভয়ানক। রাজা-প্রজায় কেবলি বিবাদ চলিতেছে। রাজা ভাবেন প্রজার প্রার্থনা সকল অতি অসঙ্গত, তাহারা যত পায় ততই চায়, কোথায় গিয়া ক্ষান্ত হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, তাহাদের আশা কিছুতেই মিটে না, রাজার রাজ্য একেবারে উল্টাইয়া দিবার চেষ্টায় আছে। প্রজারা ভাবেন রাজা নিজের সুবিধার জন্য কেবলি প্রজাপীড়ন করিতেছেন, তাহাদের ন্যায্য অধিকার সকল হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত রাখিতেছেন। প্রজাদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক মিলিয়া একটি দল বাঁধিয়াছেন, রাজার অত্যাচার নিবারণ আর প্রজার হীনাবস্থা দূর করা ইঁহাদের উদ্দেশ্য। ইঁহারা দলভুক্ত কোন ব্যক্তির বাড়িতে কিম্বা কোন নির্জ্জন স্থানে অতি গোপনে, অতি সতর্কতার সহিত একত্রিত হইয়া কি কি কায করিতে হইবে, কি নিয়মে, কি উপায়ে কোন্ কার্য্য করিতে হইবে সে বিষয়ে পরামর্শ করেন। পরামর্শ

করিয়া যাহা স্থির হয় তাহা সিদ্ধ করিবার ভার আবশ্যকমতে এক কিম্বা অনেক লোকের উপর দেওয়া হয়। যাঁহাদের উপর যে কার্য্য-সিদ্ধির ভার দেওয়া হয় তাঁহারা একেবারে যথার্থই "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ইঁহাদের প্রতিজ্ঞা পর্ব্বতের মত অটল, পর্ব্বতের মত স্থায়ী, ইঁহাদের উৎসাহ বজ্রাগ্নির মত। কোন শারীরিক কষ্ট, কোন মানসিক কষ্ট, কোন বাহিরের বাধা ইঁহাদের মনকে গম্যপথ হইতে ফিরাইতে পারে না। ইঁহারা অনেকদিন ধরিয়া অসহ্য কষ্টভোগ করিয়া, যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া প্রাণপণে যে কার্য্যসিদ্ধির জন্যে চেষ্টা করেন তাহা যদি অবশেষে বিফল হইয়া যায় তবুও ইঁহারা সে কার্য্যে বিরক্ত হন্ না। আবার নূতন উদ্যম, নূতন উৎসাহে নূতন পন্থা অবলম্বন করিয়া আগেকার মত দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, আবার অনেকদিন ধরিয়া অসহ্য কষ্টভোগ করিয়া, যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করেন। এই প্রকারে যতবারই ইঁহাদের চেষ্টা বিফল হউক না কেন প্রাণ থাকিতে ইঁহারা কখনই হতাশ হইয়া সে কার্য্যে বিমুখ হন না। কখনই এরূপ ভাবেন না যে, আমি যদি মরিয়াই গেলাম তাহাহইলে এ কার্য্যসিদ্ধি হইল আর না হইল তাহাতে আমার কি আসে যায়, আমিত আর তখন ইহার ফলভোগ করিতে আসিব না। ইঁহারা যখন একটি কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তাহা সাধন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন সেই দণ্ড হইতে সেই কর্ত্তব্যই ইঁহাদের জীবনের একমাত্র ধর্ম্ম হয়। ইঁহারা সেই ধর্ম্মপালনে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। এই দলের সকল মানুষ এক প্রাণ এক মন ঠিক যেন একজন মানুষের মত হইয়া কাব করেন, কাজ করিতে করিতে এক ব্যক্তি যেমন প্রাণত্যাগ করিলেন অমনি আর এক ব্যক্তি যেন তাঁহারি প্রাণ পাইয়া তাঁহারি মত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া তাঁহারি মত উৎসাহে তৎক্ষণাৎ সেই অসম্পূর্ণ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সহস্র সহস্র পুলিসের কর্ম্মচারী ও সহস্র সহস্র সৈনিক পুরুষ ইঁহাদিগকে ধরিবার জন্যে দিনরাত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, জনকতক লোককে একত্রে কথা কহিতে দেখিলেই অমনি রাজ-কর্ম্মচারীদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তাহাদের উপর পড়ে, তখনি একেবারে তাহাদের ধরিয়া ফেলে। এই দলভুক্ত লোকেরা হয়ত কত বৎসর ধরিয়া দিনরাত অতি সতর্কতার সহিত অতি সঙ্গোপনে অমানুষিক পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া যে কার্য্যটি সিদ্ধির চেষ্টা পাইতেছেন, যখন সিদ্ধিলাভের আর অতি অল্পই বাকি আছে দেখিয়া আগ্রহরুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে হয়ত একটা অতি তুচ্ছ ঘটনাক্রমে রাজকর্ম্মচারীদের দৃষ্টি তাঁহাদের উপরে পড়িল, অমনি এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহাদের সমস্ত জীবনের যত্ন পরিশ্রম ধ্বংস হইয়া গেল! শুদ্ধ তাহাই নহে, রাজকর্ম্মচারীরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে ধরিয়া কারারুদ্ধ করিল, তার পরে হয় তাঁদের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইবে নয়তো প্রাণদণ্ড অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণাদায়ক যে দণ্ড—অর্থাৎ সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসন—তাহাই হইবে। সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত হওয়া

সে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহা আমাদের মধ্যে কেহ মনেও আনিতে পারে না। সাইবিরিয়ায় শীত অসহ, তাপমান যন্ত্রের যে ডিগ্রিতে পারা নামিলে এমনি ঠাণ্ডা পড়ে যে জল জমিয়া বরফ হইয়া যায় সাইবিরিয়ার শীতে পারা সে ডিগ্রির চেয়ে আরও ৫০ ডিগ্রি নীচে নামিয়া যায়। সেখানে বৎসরের মধ্যে অনেক মাসে সমস্ত দিনের মধ্যে সূর্য্য কেবল দুই কি তিন ঘণ্টা প্রকাশ পায়, আর অনেক দিন একাদিক্রমে দিনরাত সমভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা যাহাদের অভ্যাস নাই, কিম্বা যাহারা ফাঁদ পাতিয়া বনজন্তু শীকার করিতে জানে না এ প্রকার লোক সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত হইলে শীতে ও ক্ষুধায় শীঘ্রই তাহাদের প্রাণ-বিয়োগ হইবার খুবই সম্ভব। এইরূপ শোনা গিয়াছে যে একজন নির্ব্বাসিত ব্যক্তি সুদীর্ঘ শীতকাল বিছানায় শুইয়া কাটাইয়া ছিলেন, কেবল মাঝে মাঝে উঠিয়া খানিকটা পচা তেল খাইতেন, এ ব্যতীত আর কোন খাবার জিনিস তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু এই দারুণ নির্ব্বাসন দণ্ডও যে উক্ত দলের লোক সংখ্যা কমাইতে পারিয়াছে এমন কোন প্রমাণ দেখা যায় না, বরং দিন দিন দল আরও বাড়িতেছে।

অনেক নির্ব্বাসিতেরা পলাইবার চেষ্টা পায়। যদিও পলায়নের পথ বিষম সঙ্কট পূর্ণ, কিন্তু সাইবিরিয়া-বাসের নরকযন্ত্রণার অপেক্ষা তাহা অধিক ভয়ানক নহে। ডেবাগোরিও মোর্গ্রিয়েভিচ্ নামক একজন সম্ভ্রান্ত নির্ব্বাসিত ব্যক্তি তাঁহার সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসন ও তথা হইতে পলায়নের যে বিবরণ নিজমুখে প্রকাশ করেন তাহা Contemporary Review হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"ধরা-পড়া"

"আমি তখন কিয়েফ্ নগরে বাস করিতাম। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে, ১১ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যার সময় ম্রিলীন্স্কি ষ্ট্রীটে রিভিচেভিচের বাসায় বিদ্রোহি দলভুক্ত কতকগুলি লোক একত্রিত হইয়া ছিলেন। আমিও সেখানে ছিলাম। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, আমরা কয়েকজন আমাদের বন্ধু মাডাম দেবিচেভের বাড়িতে গেলাম। গৃহকর্ত্রী আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। গল্প জমিয়া আসিল, দুই এক ঘণ্টাকাল বেশ আমোদে কাটান গেল।

আণ্টন্ প্রথমে উঠিলেন, তিনি রাস্তা পর্য্যন্ত গিয়াছেন কি এমন সময়ে পিস্তল ছোঁড়ার মত একটা শব্দে আমরা সকলে চম্‌কিয়া উঠিলাম। আমরা যেন হতভম্ব হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলাম, ষ্ট্রোগড্ দৌড়িয়া গিয়া জানালার ভিতর দিয়া উঁকি মারিলেন, দরজায় কান পাতিয়া শুনিলেন। কিছুক্ষণ বাদে সন্তোষজনক খবর লইয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন, রাস্তায় কোন অসাধারণ ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না, কাছাকাছি কোন দোকানের দরজা সজোরে বন্ধ করাতে

হয়ত ঐরূপ শব্দ হইয়াছিল। আমরা আবার শান্তমনে গল্প আরম্ভ করিলাম, চা খাইতে লাগিলাম। পাঁচমিনিট বাদে আবার আমাদের শান্তিভঙ্গ হইল, এবার এমন সব শব্দ আসিতে লাগিল যে তাহাতে ভুল হইবার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না। উঠানে ভারি ভারি পায়ের শব্দ, তাড়াতাড়ি কথাবার্ত্তা, হুকুমের আওয়াজ, অস্ত্রের ঝনুঝনিতে, বেশ বোঝা গেল কি হইবে।

পুলিষের লোক আমাদের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে। বেশ বুঝিতে পারিলাম যে আমরা বল প্রকাশ করিলেও বিনা মারামারিতে আমাদিগকে বাধ্য করিবে। আমাদের কাহারও নিকটে একটিও অস্ত্র ছিল না। মুহূর্ত্তকাল কষ্টকর ভাবনায় কাটিল। তার পরে দরজা সজোরে খুলিয়া গেল। দেখিলাম পাশের ঘর সৈন্যে পূর্ণ আর তাহারা সঙ্গীন নীচু করিয়া আক্রমণে প্রস্তুত। ডান্‌দিক হইতে উচ্চ ও পরিষ্কার স্বরে হুকুম আসিল “মহাশয়গণ, ছাড়িয়া দিবেন কি? আমি এই সৈন্যদলের সেনাপতি।”

আমি ফিরিয়া দেখিলাম। দেখি যে, সেনাপতি আর কেহ নয় স্বয়ং স্যুডেইকিন্, পুলিষের সাজ ও খোলা তলবারে সজ্জিত।

আতঙ্কজনক সৈন্যসজ্জা, সেনাপতির গরম মেজাজ্, সৈন্যদের কড়া চাউনি, আর ঝিক্‌ঝিকে সঙ্গীন, এ সব সত্ত্বেও আমার কেমন একটু মজা মনে হইতে লাগিল, আমি হাসি রাখিতে না পারিয়া সেনাপতিকে বলিলাম “আমরা কি একটা কেল্লা দখল করিয়া রাখিয়াছি যে আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন ছাড়িয়া দিবেন কি?”

“তা নয়, কিন্তু তোমাদের সঙ্গীদের·····”। নানা প্রকার শব্দে তাঁর কথার শেষ পর্য্যন্ত শুনিতে পাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম “কোন্ সঙ্গীদের?”

স্যুডেইকিন বলিলেন “শীঘ্রই দেখিতে পাইবে।”

তারপরে আমাদের সব খুঁজিয়া দেখিতে সৈন্যদের আজ্ঞা দিলেন, খোঁজা হইলে পুলিষে লইয়া যাইবেন।

খোঁজা শেষ হইল, আমরা ত্রিশ চল্লিশ জন অস্ত্রধারী সৈনিকপুরুষ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া লাইবেড্ থানায় চলিলাম। আমাদের গম্যস্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, কোন একটা অসাধারণ ঘটনা ঘটিয়াছে। থানা একেবারে আলোকময়, দরজার বাহিরে একদঙ্গল লোক জড় হইয়াছে, সবাই খুব মাতিয়া উঠিয়াছে। আমরা সিঁড়িদিয়া উঠিয়া সাম্‌নের ঘরে নীত হইলাম। সে ঘর অস্ত্রধারী পুরুষে পূর্ণ। আমি কষ্টেশ্রষ্টে ভিড় ঠেলিয়া দেখিলাম ঘরের অপর দিকে আমার কতকজন বন্ধু রহিয়াছেন। এ কি সর্ব্বনাশ! তাঁদের এ কি দশা হইয়াছে! পোসেন আর ষ্টেব্রিন্ কামেন্‌স্কীর হাত পা একেবারে বাঁধা; দড়ি এমনি টানিয়া বাঁধিয়াছে যে দুই হাত একেবারে পিঠের উপরে গিয়া কুনুয়ে কুনুয়ে ঠেকাঠেকি হইয়াছে। তাঁদের কাছেই মাডাম আর্ন্‌কেল্ড, সায়ানডোভিচ্ আর পাটালিজিনা। স্পষ্টই বুঝা গেল যে, আমরা কোসা-

ডোভ্স্কির বাড়ি হইতে চলিয়া যাইবার পর সেখানে কোন একটা অদ্ভুতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছিল। কিন্তু আমি আমার বন্ধুদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না কেন না তাহা হইলেই প্রমাণ হইবে যে আমরা পরিচিত। এখান ওখান থেকে যে এক আধটা কথা বাহির হইয়া পড়িতেছিল তাহা থেকেই জানিতে পারিলাম কি হইয়াছে। তাঁহারা পুলিষকে বাধা দিয়াছিলেন, একজন পুলিষের লোক মারা পড়িয়াছে, সেখানে যে কয় জন উপস্থিত ছিলেন সকলেই ধরা পড়িয়াছেন। এই সব শুনিতেছি এমন সময় একটা গোলমাল শোনা গেল—পায়ের শব্দ, চেঁচামেচি, ঝগড়ার মত গলা, আমার মনে হল যেন তার মধ্যে একটা গলার স্বর আমি চিনি। তখনি একজন লোক দুজন পুলিষের লোককে একেবারে হিচড়াইতে হিচ্ড়াইতে ছুটিয়া সেই ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িল, পুলিষের লোকেরা তাহাকে আটকাইবার জন্যে বৃথা চেষ্টা পাইতেছে। তাহার এলোথেলো চুল, পাণ্ডুবর্ণ মুখ, আরক্ত চক্ষুতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে সে ব্যক্তি তাহার বলের অতীত যুঝাযুঝি করিতেছিল।

মিনিট-কতকের মধ্যে তাহাকে ধরিয়া বলপূর্ব্বক আমাদের নিকট বসাইয়া দিল।

কর্ণেল নোভিট্স্কি আজ্ঞা দিলেন "বন্দীদিগকে পরস্পরের নিকট হইতে পৃথক্ করো।"

তৎক্ষণাৎ আমরা প্রত্যেকে চারিজন সৈনিক দ্বারা বেষ্টিত হইলাম।

কর্ণেল আজ্ঞা দিলেন "উহারা যদি বাধা দেয় তোমাদের সঙ্গীন্ চালাও"।" কিছু ক্ষণ পরে আমাদের একজনের পর আর একজনকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। আমার ডাক পড়িলে আমি গিয়া দেখিলাম সেখানে অনেকগুলি পুলিষ কর্ম্মচারী উপস্থিত, তাঁরা আবার আমার সব খুঁজিয়া দেখিলেন।

খোঁজা হইয়া গেলে কর্ণেল নোভিট্স্কি বলিলেন "অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার নাম বলুন।"

আমি উত্তর দিলাম "না বলিতে হইলেই ভাল হয়।"

কর্ণেল বলিলেন "তাহলে আমিই তোমাকে বলিয়া দিব—তুমি কে।"

আমি উত্তর দিলাম। "তাহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইব।"

কর্ণেল বলিলেন—"তোমাকে লোকে ডেবাগোরিও মোক্রিয়েভিচ্ বলিয়া ডাকে।" আমি বলিলাম—"কর্ণেল, আপনার সহিত আলাপ হওয়াতে আনন্দিত হইলাম।"

আমার নাম ভাঁড়াইতে চেষ্টা করা বৃথা। আমার মা, ভাই, ভগিনী সকলেই কিয়েফে ছিলেন, আমার পরিচয় পাইবার জন্যে যে তাঁদের-সুদ্ধ থানায় টানিয়া আনিবে তাহা আদবেই আমার ইচ্ছা ছিল না।

ক্রমশঃ।

স্বাধীনতা।

(বালকের রচনা)

আজ কাল স্বাধীনতা লইয়া অনেক কথা হইয়া থাকে। স্বাধীনতা ভাল বই মন্দ নয়, কিন্তু তাই বলিয়া স্বাধীনতাই যে সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় তাহা নহে। আমাদের কতকগুলি প্রবৃত্তির স্ফূর্ত্তি ও হৃদয়ের বলের নিমিত্ত স্বাধীনতা আবশ্যক বটে, কিন্তু সেই প্রবৃত্তি সেই বল কাহার উপর কি রকম করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে তাহার সাধনা ও শিক্ষা স্বতন্ত্র। স্বাধীনতায় কেবল একটা অন্ধশক্তি, একটা যন্ত্র পাইলাম মাত্র। কিন্তু একটা অন্ধশক্তি, একটা যন্ত্র লইয়া আমাদিগের কি আবশ্যক? আমরা যদি আমাদিগের প্রবৃত্তি, আমাদিগের শক্তি ভাল রূপে প্রয়োগ করিতে না পারিলাম তবে তাহা থাকাও যা না থাকাও তা। সেই জন্যই আমাদিগের সর্ব্বাগ্রে সংযম শিক্ষা করা উচিত। স্বাধীনতা আমাদিগকে অভিনয় স্থলে ছাড়িয়া দেয় বটে, কিন্তু কি অংশ কিরূপে অভিনয় করিতে হইবে তাহার কিছু মাত্র উল্লেখ করে না। মনুষ্যের যদি কেবল মাত্র স্বাধীনতা আবশ্যক হইত, সংযম শিক্ষা আবশ্যক না হইত, তাহা হইলে মনুষ্যে এবং পশুতে কিছু প্রভেদ থাকিত না। বন্য পশুদেরও স্বাধীনতা আছে, উহারাত কাহারও অধীন নহে, উহাদের রাজশাসনও নাই, সমাজ শাসনও নাই। তবে মনুষ্যে এবং পশুতে কি প্রভেদ? মনুষ্যে এবং পশুতে এই প্রভেদ যে মনুষ্যের সংযম শক্তি আছে, পশুর তাহা নাই। এই জন্যই মনুষ্য পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। স্বাধীনতা যেমন ইচ্ছা করিলেই আমরা অনেকটা পাইতে পারি, সংযম সেরূপ নয়। ইহা শিক্ষা করা আবশ্যক। এই জন্য গুরুজনের নিকট আমাদিগের বাধ্যতা স্বীকার করিতে হইবে, তাঁহারা যাহা আদেশ করিবেন তাহা পালন করিতে হইবে। গুরুজন যেমন আমাদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন এমন কেহই পারেন না। স্বাধীনতার ভাব ঈশ্বর আমাদিগের সকলেরই হৃদয়ে অর্পণ করিয়াছেন, শিশুরও হৃদয়ে স্বাধীনতার ভাব আছে, সে তাহার স্বাভাবিক শক্তি পরিচালনার সময় কোনরূপ বাধা পাইতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু যদি তাহাকে তাহার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে দেওয়া যায় পিতা মাতা যদি তাহাকে আত্ম-সংযম করিতে শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে তাহার কি অমঙ্গল! শিশু অগ্নি দেখিয়া ছুঁইতে চায়, সাপ দেখিয়া ধরিতে যায়, পিতা মাতা যদি তাহাকে নিবারণ না করেন, প্রতি মুহূর্ত্তে যদি তাহার উদ্যম বিফল করিয়া না দেন তবে তাহার কি দুর্ভাগ্য! আমরা মনে করি বৃক্ষ লতা স্বাধীন ভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কিন্তু ঠিক তাহা নহে, জড় প্রকৃতির নিয়ম অদৃশ্য-ভাবে উহার মধ্যে কার্য্য করিয়া থাকে। বৃক্ষ প্রকৃতির কঠিন

নিয়মে বদ্ধ। তাহার এক পা এদিক ওদিক হইবার যো নাই। কিন্তু মনুষ্য তডটা বদ্ধ নহে। এই জন্যই মনুষ্যের নিজেকে নিজে বদ্ধ করা আবশ্যক হয়। আপনাকে আপনি নিয়মে বদ্ধ করার নামই সংযম সাধন করা। যখন এমন হইবে যে আমরা আমাদিগের শক্তি ভাল রূপে প্রয়োগ করিতে পারিব তখন আমাদিগের স্বাধীনতা সার্থক হইবে।

বারো আনা ও ষোল আনা।

(বালকের রচনা)

বৈশাখের অপরাহ্ন। উত্তর-পশ্চিমে মেঘ করিয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় নদী পার হইতেছেন।

পার হইতে হইতে ডিঙ্গির মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁ হে মাঝি, তুমি অঙ্ক কষিতে জান?"

মাঝি খানিকটা হাঁ করিয়া থাকিয়া কহিল—"অঙ্ক কষা কাকে বলে পণ্ডিত মহাশয়! অঙ্ক বুঝি বড় বড় জাহাজে কষে? আমাদের এ ছোট ডিঙ্গি—কেবল হাল ধর্‌লে আর দাঁড় টান্‌লেই চলে যায়—অঙ্ক কষতে হয় না!"

পণ্ডিত মহাশয় মাঝির অজ্ঞতা দেখিয়া সুগভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—"হায়, হায়, অঙ্ক জান না—তোমার জীবনের চার আনা মূল্য ক'মে গেল!"

মাঝি এই লোকসানের খবরটা পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল। পণ্ডিত মহাশয় দুই এক টিপ নস্য সেবন করিয়া বলিলেন—"বোধ করি গণিত-শাস্ত্র অল্পস্বল্প জানা আছে!"

মাঝি ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"আমি জাতে জেলে, শাস্তর আমি কি জানি! শাস্তরের কথা যদি বলেন ত আমাদের চক্রবেড়ের চক্রবর্ত্তী মশায় যেমন শাস্তর জানে এমন কেউ জানেনা—তিনি দাতাকর্ণ এক নিশ্বিসে বলে ফেলে গা! এ কি সাধারণ কথা!"

পণ্ডিত মহাশয় ঘোরতর বিমর্ষ হইয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"হায় হায়— গণিত শাস্ত্র জান না! তোমার জীবনের আর চার আনা দাম কমে গেল।"

মাঝি তাহার এই জীবনের হিসাব ভাল বুঝিতেই পারিল না—সে মনে মনে ভাড়ার পাওনা হিসাব করিতে লাগিল। দেখিল তাহাতে এক পয়সা কম পড়ে নাই—তাহাতেই নিশ্চিন্ত হইল। নৌকা নদীর মাঝামাঝি গেলে পণ্ডিত মহাশয় কিঞ্চিৎ উৎসাহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"জ্যোতিষ শাস্ত্র অবশ্যই তোমার জানা আছে।

কারণ, জ্যোতিষ শাস্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নৌ-চালন বিদ্যার ঢের বেশী উন্নতি হয়েছে। জ্যোতিষ না জানা থাকলে তোমার নৌকা একদূর কখনই এগোত না!"

মাঝি নিতান্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল "পণ্ডিত মশায় আমাকে ঠাট্টা কচ্চেন। জ্যোতিষ জানে বটে আমাদের ব্রজ আচায্যি! তিনি পাঁজি খুলেই বলে দেন কবে লাউ খেতে নেই কবে বেগুন খেতে নেই!"

জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্রজ আচার্য্যের এইরূপ অসাধারণ দখলের কথা শুনিয়াও পণ্ডিত-মহাশয় কিছু মাত্র আশ্চর্য্য প্রকাশ করিলেন না। তিনি মাঝির অজ্ঞতা লইয়াই হায় হায় করিতে লাগিলেন। "জ্যোতিষ জান না, তোমার জীবনের আরও শিকি বাদ পড়িল!"

এমন সময়ে হটাৎ ঝড় উঠিল—নৌকা আর থাকে না। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের সে দিকে বড় খেয়াল নাই। তিনি মাঝির পরম মূর্খতা লইয়া দুঃখে অভিভূত হইয়াছেন। কেবল মাঝে মাঝে এক এক টিপ নস্য টানিয়া কতকটা সান্ত্বনা পাইতেছেন। এমন সময়ে নৌকার অবস্থা মন্দ দেখিয়া মাঝি জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল—"পণ্ডিত মহাশয়, সাঁতার জানেন?"

পণ্ডিত মহাশয় কিঞ্চিৎ শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"না হে।"

মাঝি কহিল—"মশায়, আমার জীবনের ত বারো আনা বাদ দিয়াছিলেন—এখন আপনার জীবনের যে ষোল আনাই বাদ পড়ে!"

মুখ-চেনা।

রাস্তায় বাহির হইলে কত রকম ধরণের মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। কোন মুখ দেখিলে কাছে যাইতে ইচ্ছা করে—কোন মুখ দেখিলে পলাইতে ইচ্ছা হয়। কোন মুখ দেখিলে মনে হয় সে হাজার অপরাধী হউক, সে যেন আমার কত দিনের জানা-শুনা আবার কোন মুখ দেখিলে মনে হয় যেন আমাদের মারিতে আসিতেছে, না খাইতে আসিতেছে।

কত রকম নাক দেখিতে পাওয়া যায়। কোনটা খাঁদা, কোনটা তোলা—কোনটা সোজা—কোনটা বাঁকা। কোন নাক দেখিলে মনে হয়, লোকটা বেশ সৌখীন—কোন নাক দেখিলে মনে হয়, লোকটা বড় জাঁহাবাজ।

যাহারা ভাল করিয়া কিছুই দেখেনা তাহারা মনে করে সব মানুষের ঠোঁট প্রায় এক রকম। কিন্তু ঠোঁটের কত রকম গড়ন দেখা যায়। কোন ঠোঁট্ দেখ্‌লে মনে হয় স্নেহে চুম্বনে গড়া। কোন ঠোঁট্ দেখলে মনে হয়, লোকটা বড় খট্‌খটে তার স্নেহ মমতা কিছুই নাই।

একজন লোককে দেখ্‌বামাত্রই তার সম্বন্ধে একটা-না-একটা ভাব আমাদের মনে

উদয় হয়। লোক-চেনার অভ্যাস ভাল রকম না থাকিলে অনেক সময় আমরা ভুল করিতে পারি। ভাল লোককেও মন্দ মনে করিতে পারি, মন্দ লোককেও ভাল মনে করিতে পারি। লোক চেনাও বড় সহজ নয়। কতকগুলি অক্ষর শি[illegible], ও [illegible] যোগাযোগে যত বাক্য হয় তাহা শিখিলে যেমন আমরা একটি ভাষা শিখিতে পারি, সেইরূপ মুখ চিহ্ন দেখিয়াও আমরা মানুষের চরিত্র বুঝিতে পারি। কিন্তু মনুষ্য চরিত্র এত বিভিন্ন যে তাহার অনুরূপ মুখের গঠন চিহ্নও অসংখ্য। তাহা আয়ত্ত করা সহজ নহে। সেই জন্য পণ্ডিতেরা এখনও ইহাকে বিজ্ঞানে পরিণত করিতে পারেন নাই। এই বিষয় অনুশীলন করিয়া তাঁহারা যে সকল চিহ্ন ও নিয়ম বাহির করিয়াছেন তাহা সকলেই অনায়াসে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। এইরূপ পরীক্ষায় আমোদও আছে, উপকারও আছে।

কারবারে অধিকাংশ কাজ বিশ্বাসে বিশ্বাসে চলে। যাহাদের লোক চিনিবার অভ্যাস নাই তাহারা, যে কাজের যে উপযুক্ত তাহা বুঝিয়া লোক রাখিতে পারে না, হয়তো অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং এইরূপ করিয়া কত লোকে ক্ষতিগ্রস্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হয়। এইরূপ মুখ পরীক্ষায় আর একটি ফল হয়। আমরা বাঙ্গালী আমরা চতুর্দিকে যাহা দেখি, কিছুই ভাল করিয়া দেখি না। সব জিনিসই যেন আমরা চোক বুজিয়া দেখি। হালে কলিকাতায় যে মহামেলা হইয়াছিল তাহা দেখিবার জন্য অসংখ্য লোক তো গিয়াছিলেন, কিন্তু কাহাকেও জিজ্ঞাসা কর দেখি, অমুক জিনিসটা কিরূপ দেখিলে—অমনি চক্ষুস্থির। কেহ বলিলেন হয়তো "বেশ দেখিলাম, চমৎকার দেখিলাম, এমন ভাল যে না দেখিলে বুঝান যায় না"—কেহ বলিলেন—"তাতে এমন একটা ইয়ে আছে যে ইয়ে হয়েছে সেটা কিছুতেই ইয়ে করা যায় না।"—একজন ইংরাজকে জিজ্ঞাসা কর তিনি প্রত্যেক জিনিসের তন্নতন্ন বর্ণনা করিবেন—একটি খড়িকা পর্য্যন্ত তিনি ছাড়িবেন না। তাই বলিতেছি যদি এই মুখ পরীক্ষায় আর কোন ফল না হয়, অন্ততঃ খুঁটিনাটি করিয়া দেখিবার অভ্যাসটি হয়। এইবার তবে আসল বিষয়ে আসা যাক।

কপাল যে বুদ্ধির প্রধান স্থান তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বুদ্ধি দুই রকম। একটি হচ্চে—খুটিনাটি করিয়া দেখিবার ক্ষমতা—আর একটি—আলোচনা ও চিন্তা করিবার ক্ষমতা।

কপালের উপর ভাগে চিন্তা শক্তি অবস্থিত।

চিন্তা শক্তি—অর্থাৎ তুলনা করিবার শক্তি, বস্তু সকল পৃথক করিয়া দেখিবার শক্তি, শ্রেণী বিভাগ করিবার শক্তি এবং কার্য্য দেখিয়া কারণ অনুসন্ধান করিবার শক্তি। যাহাদিগের কপালের উপর দিকটা উঁচু—তাহাদিগের এই চিন্তাশক্তি প্রবল।

কপালের নীচের ভাগে, খুঁটিনাটি করিয়া দেখিবার শক্তি অর্থাৎ পর্য্যবেক্ষণ শক্তি

আবৃহিত। এই শক্তি যাহাদিগের প্রবল তাহাদিগের সমস্ত পৃথিবী দেখিবার ইচ্ছা হয়, বিজ্ঞান শিখিতে ইচ্ছা হয়, ভাষা শিখিতে ইচ্ছা হয়, এবং সকল তথ্য তন্ন তন্ন করিয়া জানিবার ইচ্ছা হয়। এই শক্তি ডারুইন, ও জন্‌ষ্টুয়ার্ট মিলের অত্যন্ত প্রবল ছিল।

কপালের মধ্য ভাগ ভরা থাকিলে, ঘটনার স্মরণ শক্তি প্রকাশ পায়।

যদি কপালের উপরের ভাগ নীচের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বড় হয় তাহা হইলে এই বুঝায় যে সেই লোকের যতটা বেশি চিন্তা শক্তি ততটা পর্য্যবেক্ষণ শক্তি নাই। বিজ্ঞান অপেক্ষা দর্শনে তাহার বেশি ঝোঁক্—ধরা-ছুঁয়া যায় এরূপ লৌকিক বিষয় অপেক্ষা সৃষ্টি ছাড়া আস্‌মানি চিন্তায় তাঁহার অধিক আমোদ। অধ্যাপক Owen কতকটা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

উপরি ভাগের কপালের পাশের দিক যাঁহার বেশি বড় হয় তাঁহার কারণ অনুসন্ধানের শক্তির সঙ্গে সঙ্গে রসিকতা ও হাসি তামাসার ভাব প্রবল। এই ভাবটি থাকিলে যাহা-কিছু হাস্যজনক বা অদ্ভুত সহজেই তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়। এবং বর্ত্তমান সমাজের কুপ্রথা লইয়া বিদ্রূপ করিতে ইচ্ছা যায়। Sterne, Hogarth, Hood—বঙ্কিম বাবু ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

আরও উঁচু দিকে ও পশ্চাদ্দিকে যদি কপাল প্রশস্ত হয় তাহা হইলে কল্পনা শক্তি কবিতা শক্তি বা শিল্পশক্তির লক্ষণ প্রকাশ পায়। সেক্সপিয়ার, গেটে, র‍্যাফেল, ডোরে প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

কপালের মধ্যস্থলে কসি-টানা বলি-রেখা থাকিলে বুঝায় যে যাহার উহা আছে সে ব্যক্তি লোকের উপকার সাধনে রত। দুই ভুরুর মধ্যভাগে যাহার দাঁড়ি-টানা বলি-রেখা আছে, সে লোক খাঁটি ও সত্য পরায়ণ।

যাহার নীচের দিগের কপাল অত্যন্ত ছোট এবং মনে হয় যেন ভিতরে বসা, সচরাচর চলিত ঘটনা ও তথ্য সম্বন্ধে তাহার অত্যন্ত ভাসা-ভাসা জ্ঞান এবং আপনার দোষের প্রতি সে ব্যক্তি অন্ধ। এই সকল ব্যক্তি প্রায়ই হতভাগ্য দুরদৃষ্ট ও অকৃতকার্য্য হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে তাহারা চক্ষু মেলিয়া চারিদিকের পদার্থ দেখে না—এবং চারিদিককার পদার্থ তাহাদিগের মনের উপর ভাল করিয়া বসে না। এইজন্য তাহারা ক্রমাগত ভুল করে এবং প্রায়ই আপনার দুর্দ্দশার জন্য অন্যকে দোষী করে। এই সকল লোকের ব্যবসা বাণিজ্যে হাত দেওয়া উচিত নহে। পর্য্যবেক্ষণ শক্তিকে বলবতী করিয়া তবে কাজকর্ম্মে প্রবেশ করা উচিত। নতুবা পরিণামে অকৃতকার্য্য ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

প্রশস্ত উচ্চ এবং ভরা কপাল হইলে, বিশেষতঃ তাহার সহিত যদি দৃঢ় ওষ্ঠ থাকে এবং পরিষ্কার তীক্ষ্ণ চক্ষু থাকে তাহা হইলে উন্নতিশীল, সর্ব্বগ্রাহী দার্শনিক, সমাজ সংস্কার-রত এবং বৃহৎ ব্যাপারে নিযুক্ত মন সূচিত হয়। যেমন Bentham, Mill, Cobden, বিদ্যাসাগর।

সংস্কারকগণ মাত্রেরই কপাল উচ্চ প্রশস্ত এবং ভরা ভরা।

ছোট বেলায় কবুডেনের কপাল বড় প্রশস্ত ছিল না কিন্তু লোকের জন্য খাটিতে খাটিতে এবং বুদ্ধি চালনা করিয়া তাঁহার জীবনের শেষ ভাগে তাঁহার কপাল বিলক্ষণ প্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

যাহাদিগের কপাল অত্যন্ত নীচু তাহাদিগের স্নেহ মমতা, চরিত্রের উদারতা কম। যাহাদিগের কপাল উচ্চ এবং খোলারকম মুখের ভাব তাহারা পরোপকারে রত এবং অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকারে পরাঙ্মুখ হয় না। যেমন বিদ্যাসাগর।

এক্ষণে, আমাদের দেশের খ্যাতনামা দুই ব্যক্তির চিত্র দেওয়া যাইতেছে। রাজনারায়ণ বাবু ও বঙ্কিম বাবু। যাঁহার দাড়ি গোঁফ আছে তিনি রাজনারায়ণ বাবু, যাঁহার দাড়ি গোঁফ কামান দেখিতেছ তিনি বঙ্কিম বাবু। আমরা বঙ্কিম বাবুর যে ছবি আঁকিয়াছিলাম লিপিকর তাহার ঠিক অনুকরণ করিতে পারে নাই, তাই বঙ্কিম বাবুর চোখ ও মুখের ভাব অবিকল হয় নাই। ইহাঁদের কপাল লক্ষ্য করিয়া দেখ। উভয়েরই কপাল উৎকৃষ্ট। রাজনারায়ণ বাবুর উপরিভাগের কপাল নিম্নভাগের কপাল অপেক্ষা বেশি ভরাট। এই জন্য বিজ্ঞান অপেক্ষা তত্ত্বজ্ঞানের দিকে রাজনারায়ণ বাবুর বেশি ঝোঁক। ইহার ফল,—তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থ "ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা।" রাজনারায়ণ বাবুর মধ্য-কপালও ভরা-ভরা—ইহাতে ইহাঁর ঘটনার স্মরণ শক্তি সূচিত হইতেছে। এই জন্য ইতিহাসে তাঁহার বিলক্ষণ দখল আছে এবং ছোট ছোট রাশি রাশি ঘটনার গল্প তিনি অজস্র করিতে পারেন এবং তাঁহার লেখাতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—তাঁহার লেখা "সেকাল-একাল" তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। তাঁহার উপর-দিক্‌কার কপাল ভর-পুর থাকায় তাঁহার নানাপ্রকার মৎলব (Plan) মাথায় আইসে—এবং নীচের দিককার কপাল ততটা ভরাট না থাকায় এক এক সময় সে সব মৎলব অনেকটা আস্‌মান-বিলাসী সৃষ্টি ছাড়া হইয়া পড়ে।

বঙ্কিম বাবুর উপরি ভাগের কপাল উচ্চ ও প্রশস্ত। ইহাতে বিশ্লেষণ শক্তি সমালোচন শক্তি ও হাস্যরস প্রকাশ পায়। আবার ইহাঁর নীচের দিককার কপাল বেশ উঁচু—ইহাতে ছোট খাট জিনিস খুব ইহাঁর নজরে পড়ে। তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞানের দিকে ইহাঁর বেশি ঝোঁক প্রকাশ পায়। তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় লিখিতে গেলেও ইনি বিজ্ঞানের প্রণালী অবলম্বন করিয়া লিখিতে ইচ্ছা করিবেন। বিশ্লেষণ শক্তি, পর্য্যবেক্ষণ শক্তি অধিক পরিমাণে থাকায় তাঁহার উপন্যাসে মানব চরিত্রের ও বাহ্য প্রকৃতির বর্ণনায় এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। এবার নাকি কেবল কপালের বিষয় এ প্রস্তাবে লিখিবার কথা। তাই চোখ মুখ নাকের বিষয় বলা গেল না; বঙ্কিম বাবুর এই চিত্রের প্রসঙ্গে দুই একটা কথা সে বিষয়ে না বলিয়াও থাকা যায় না। বঙ্কিম বাবুর অসাধারণ নাক। এই নাকে, সুরুচি, অভিনিবেশ, মানব চরিত্র জ্ঞান ও অসাধারণ উদ্যম প্রকাশ পায়। তাঁহার এজ্‌লাসি কাজসত্বেও, উপর্য্যুপরি এত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যে তিনি লিখিতে

পারিয়াছেন সে কেবল তাঁর নাকের জোরে। রাজনারায়ণ বাবুও তাঁহার রোগের ভাণ্ডার শরীরটিকে লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে যে এত খাটিয়াছেন তাহাও তাঁহার নাকের জোরে। ইঁহার নাকেও মনের বল প্রকাশ পায়। বঙ্কিম বাবুর ঠোঁট খুব সরু—ইহাতে কার্য্যকরী বুদ্ধি—সূক্ষ্ম রুচি ও অসাধারণ দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। বঙ্কিম বাবুর চোখে বহির্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পায় এবং রাজনারায়ণ বাবুর চোখে অন্তর্দৃষ্টি ও স্বপ্নভাব প্রকাশ পায়। বঙ্কিম বাবুর চেহারায় নেপোলিয়নের মুখের কিছু আভাস পাওয়া যায়। নেতার লক্ষণ ইঁহার মুখে জাজ্বল্যমান। ইঁহার খড়্গ-নাসা, চাপা ঠোঁট, তীক্ষ্ণ চোখ লইয়া ইনি যদি কাহারও উপরে গিয়া পড়েন তবে সে হতভাগা বজ্রাঘাতের মর্ম্ম বুঝিতে পারে। বঙ্কিম বাবুর নাকের নিম্ন দেশ যেরূপ ঝুঁকিয়া আসিয়াছে, এবং তাঁহার চিবুকের নীচে যেরূপ ফুলা দেখা যাইতেছে ইহাতে তাঁহার অর্থোপার্জ্জনস্পৃহা ও মিতব্যয়িতা প্রকাশ পাই-তেছে। বঙ্কিম বাবুর চরিত্রের সহিত আমাদের এ কথা মেলে কি না আমরা ঠিক বলিতে পারি না। চোক নাক ঠোঁট প্রভৃতি মুখাবয়বের কি কি লক্ষণে কি কি ভাব প্রকাশ পায় তাহা পরে লেখা যাইবে।

ফুলের ঘা।

বসন্ত বালক মুখ্-ভরা হাসিটি,
　　বাতাস ব'য়ে ওড়ে চুল।
শীত চলে যায়, মারে তার গায়
　　মোটা মোটা ফোটা ফুল।
আঁচল ভ'রে গেছে, শত ফুলের মেলা,
গোলাপ ছুঁড়ে মারে টগর চাঁপা বেলা,
শীত বলে "ভাই, এ কেমন খেলা!
　　যাবার বেলা হল, আসি!"
বসন্ত হাসিয়ে বসন্ ধ'রে টানে,
পাগল ক'রে দেয় কুহু কুহু গানে,
ফুলের গন্ধ নিয়ে প্রাণের পরে হানে,
　　হাসির পরে হানে হাসি।
ওড়ে ফুলের রেণু, ফুলের পরিমল,
ফুলের পাপ্‌ড়ি উড়ে করে যে বিকল,

BY M.C.HALDER

বালক।

১ ম ভাগ। | জ্যৈষ্ঠ ১২৯২। | ২ য় সংখ্যা।

মা লক্ষ্মী।

কার্ পানে, মা, চেয়ে আছ মেলি দুটি করুণ আঁখি !
কে ছিঁড়েছে ফুলের পাতা, কে ধরেছে বনের পাখী !
কে কারে কি বলেছে গো, কার প্রাণে বেজেছে ব্যথা,
করুণায় যে ভরে এল দুখানি তোর আঁখির পাতা !
খেল্‌তে খেল্‌তে মায়ের আমার আর বুঝি হল না খেলা !
ফুলের গুচ্ছ কোলে প'ড়ে কেন মা এ হেলাফেলা !
অনেক দুঃখ আছে হেথায়, এ জগৎ যে দুঃখে ভরা,
তোমার দুটি আঁখির সুধায় জুড়িয়ে গেল নিখিল ধরা।
লক্ষি আমার, বল্‌দিকি মা লুকিয়ে ছিলি কোন্ সাগরে !
সহসা আজ কাহার পুণ্যে উদয় হলি মোদের ঘরে !
সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলি হৃদয়-ভরা স্নেহের সুধা,
হৃদয় ঢেলে মিটিয়ে যাবি এ জগতের প্রেমের ক্ষুধা।
থামো, থামো, ওর কাছেতে কয়োনা কেউ কঠোর কথা,
করুণ আঁখির বালাই নিয়ে কেউ কারে দিওনা ব্যথা !
সইতে যদি না পারে ও, কেঁদে যদি চলে যায়—
এ ধরণীর পাষাণ প্রাণে ফুলের মত ঝরে যায় !
ওযে আমার শিশির কণা, ওযে আমার সাঁজের তারা।
কবে এল, কবে যাবে, এই ভয়েতে হইরে সারা !

লাঠির উপর লাঠি।

সম্পাদক মহাশয়

আপনি ব্যায়াম চর্চ্চা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন সে বিষয়ে কাহারও দ্বিরুক্তি করিবার সম্ভাবনা নাই। ক্ষুদ্র বুদ্ধিবশতঃ আমার মনে দু একটা প্রশ্নোদয় হইয়াছে। সংশয় দূর করিয়া দিবেন।

আপনি ইয়ুরোপীয় ও আমেরিকানদের সঙ্গে আমাদের যে তুলনা করিয়াছেন সে তুলনা ভাল খাটে না। আমাদের ব্যায়াম চর্চ্চা কর্ত্তব্য বোধে করিতে হইবে, য়ুরোপীয়দের ব্যায়াম চর্চ্চার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। সে অনেকটা জল বায়ুর গুণে। শীতের হাত এড়াইবার প্রধান উপায় ব্যায়াম চর্চ্চা। গ্রীষ্মের হাত এড়াইবার প্রধান উপায় যথাসাধ্য বিরাম। তবে যে ইংরাজেরা এদেশে আসিয়াও ব্যায়াম ভুলেন না তাহার কারণ আজীবন ও পুরুষানুক্রমিক সংস্কার। আমরাও বোধ করি বিলাতে গেলে আমাদের জড়তা সম্পূর্ণ পরিহার করিতে পারি না।

দ্বিতীয় কথা—দেখিতে হইবে আমরা কি খাই ও ইয়ুরোপীয়েরা কি খায়। ইয়ুরোপীয়েরা যে মদ মাংস খায় তাহার প্রবল উত্তেজনায় তাহাদের এক দণ্ড স্থির থাকিতে দেয় না। আমরা ডাল ভাত খাইয়া অত্যন্ত স্নিগ্ধ থাকি, চোকে ঘুম আসে। তবে কি খাদ্য পরিবর্ত্তন করিতে হইবে? সে কি সহজ কথা। আর ইয়ুরোপীয়দের খাদ্য আমাদের দেশে খাটে কি না খাটে তাই বা কে বলিবে। কেবল সে কথা নহে। এত টাকা কোথায়! পেট ভরিয়া ডাল ভাত তাই জোটে না। নূনের ট্যাক্সের দায়ে অনেক গরীব শুদ্ধ ভাত খাইয়া মরে, নুনও জোটে না। এদেশে সকলে মিলিয়া যে মাংস খাইতে আরম্ভ করিবে সে সম্ভাবনাও অত্যন্ত বিরল।

ছাত্রেরা যে খেলাধূলা আমোদ প্রমোদ ভুলিয়া ঘরে বসিয়া বিদেশী ব্যাকরণের শুষ্ক সূত্র, বীজ গণিতের কঠিন আঁটি ও জ্যামিতির তীক্ষ ত্রিকোণ চতুষ্কোণ গিলিতে থাকে, তাহার অবশ্যই একটা কারণ আছে। জ্যামিতি বীজগণিতের প্রেমে পড়িয়া তাহারা কিছু নিতান্তই আত্মহত্যা করিতে বসে নাই। আসল কথা এই যে আমরা নিতান্ত গরীব, আমরা যে কত গরীব সম্পাদক মহাশয়ের বোধ করি তাহা ধারনা নাই। সম্পাদক মহাশয় বোধ করি ঠিক কল্পনা করিতে পারেন না যে তাঁহার বালকের দু টাকা মূল্য দিবার সময় আমাদিগকে কত ভাবিতে হয়। আমি যে কাগজ খানায় লিখিতেছি তাহাতে তাঁহারা জুতাও মোড়েন না। যে কলমটায় লিখিতেছি তাহা তাঁহাদের কান চুল্‌কাইবারও অযোগ্য। আমাদের সবুর করিবার সময় নাই। বিদ্যাটাকে আফিসের ভাতের মত গিলিতে হয়।

পান তামাক খাইবারও সময় থাকে না। সম্পাদক বলিবেন তাহাতে ত ভাল লেখা হয় না। কে বলে যে হয়। এক্জামিন্ পাশ হয় সন্দেহ নাই। যদি কেহ বলেন মাঝে মাঝে খেলাধূলা না থাকিলে এক্জামিনও পাশ হয় না, তবে তাহার প্রমাণাভাব। বাঙ্গালীর ছেলের আর যাই দোষ থাক্ পাশ করিতে তাহারা যে পটু এ কথা শত্রু পক্ষীয়-দিগকেও স্বীকার করিতে হয়।

তাড়াতাড়ি পাস না করিলে চলে কই? আমাদের টাকাও অল্প, জীবনও অল্প, অথচ দায় অল্প নয়। সৌভাগ্যক্রমে আমার পিতা বর্ত্তমান। তিনি মাসে চল্লিশটি টাকা করিয়া বেতন পান। শীঘ্রই বাধ্য হইয়া পেন্সন লইতে হইবে। আমার দুটি ছোট ভাই আছে। আমি বিদ্যা সমাপন করিয়া কিঞ্চিত রোজগার করিলে তবে তাহাদের রীতিমত অধ্যয়নের কতকটা সুবিধা হইবে। আমি গত বৎসর এল্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছি। এব, এ পর্য্যন্ত পড়িয়া একটা যৎসামান্য চাকরি জোটাইতে নিদেন পক্ষে আর পাঁচটা বৎসর মাথা খুঁড়িতে হইবে। ইতিমধ্যে আমার ভগীটির বিবাহ না দিলে নয়। আমরা কায়স্থ। আমাদের ঘর হইতে মেয়ে বিদায় করিতে হইলে যথার্থই ঘরের লক্ষ্মী বিদায় করিতে হয়। সে যখন যায় ঘর হইতে সোনা রূপার চিহ্ন মুছিয়া যায়। এসিড্-বিশেষে বাসনের গিল্টি যেমন ওঠাইয়া দেয় আমাদের মেয়েরা তেমনি গৃহের স্বচ্ছলতা উদরের অন্ন উঠাইয়া লইয়া যায়। ঋণ দায় গ্রহণ করিয়া কন্যাদায় মোচন করিতে হয়। বাবার মুখে অন্ন রোচে না, মায়ের নিদ্রা হয় না। পড়া শুনা আর চলে না, চাকরির চেষ্টা দেখিতেছি। বালকের কার্য্যাধ্যক্ষের কিম্বা কেরাণীর কিম্বা কোনও-একটা কাজ খালি যদি হয় তবে হতভাগ্যকে একবার স্মরণ করিবেন।

ভগ্নীর বিবাহ দিতে হইলে নিজে বিবাহ করিতে হইবে। তাহা হইলে হাতে কিঞ্চিৎ টাকা আসিবে। যে হতভাগ্যের ভগ্নীকে বিবাহ করিব তাহার ভাবিলে রস্-কস্ কিছু বাকি থাকিবে না। তাহার পাতে পিঁপ্ড়ার হাহাকার উঠিবে।

আমি সবে এল্ এ পাস করিয়াছি, আমার দর বেশি নয়। বিবাহ করিয়া নিতান্ত বেশি কিছু পাইব না। কিন্তু সংসারের নতুন বোঝার চাপুনি যে মাথায় পড়িবে তাহাতে মাথা তুলিবার শক্তি থাকিবে না।

খেলাধুলা ছাড়িয়া কেন যে দিনরাত্রি ব্যাকরণ লইয়া পড়িয়াছি তাহা বোধ করি সম্পাদক মহাশয় এতক্ষণে কিছু বুঝিয়াছেন। কেবল পাশ করিলেই চলিবে না, যাহাতে ছাত্রবৃত্তি পাই সে চেষ্টাও করিতে হইবে। আমার মত ও আমার চেয়ে গরীব তের আছে। ছাত্রবৃত্তির প্রতি তাঁহারা সকলেই লুব্ধনেত্রে চাহিয়া—এমন স্থলে লাঠি ঘুরাইয়া ব্যায়াম করিতে কি ইচ্ছা যায়? পেটের দায়ে বিলাতে দরজীর মেয়েরা খেলা ভুলিয়া সূর্য্যালোক ও মুক্ত বায়ু ছাড়িয়া কামিজ সেলাই করিতেছে। কবি হুড তাহাদের বিলাপ গান জগতে প্রচার করিয়াছেন। আমরাও পেটের দায়ে লাঠি ঘুরা-

ইয়া ব্যায়াম করিতে পারি না, দিন রাত্রি ব্যাকরণের দুয়ারে মাথা খুঁড়িতেছি। কই, আমাদের দুঃখের কথাত কোনও মহাকবি উল্লেখ করেন না। উল্টিয়া স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম জানি না বলিয়া মাঝে মাঝে ভর্ৎসনা সহিতে হয়। (বোধ করি যত সব স্কুল-পালানে ছেলেই কবি হয়, একজামিনের যন্ত্রণা তাহারা জানে না।)

আমি একজন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ভাল ইংরাজের কাছে শুনিয়াছি যে সেখানকার দরিদ্র ছেলেরা মাথায় ভিজে তোয়ালে বাঁধিয়া ছাত্রবৃত্তির জন্য যে রূপ গুরুতর পরিশ্রম করে আমরা তাহার সিকিও পারি না। তাহাদের অনেকে নৌকার দাঁড় টানে না, ক্রিকেট্ খেলে না, বই কামড়াইয়া পড়িয়া থাকে। সেখানকার ঠাণ্ডা বাতাসের জোরে টিকিয়া থাকে, পাগল হইয়া যায় না। সেখানকার চেয়ে এখানে এরূপ ছাত্রের সংখ্যা যদি বেশি দেখা যায় তবে এই বুঝিতে হইবে এখানে দরিদ্রের সংখ্যাও বেশি। এখানকার ছেলেরা যদি আমেরিকার ছেলেদের মত লাঠি না ঘুরায় তবে তাহাতে আর কাহারও দোষ দেওয়া যায় না, সে দারিদ্র্যের দোষ। ছাত্রদের বুঝিতে বাকি নাই যে ব্যায়াম চর্চা করিলে শরীর সুস্থ হয় এবং সুস্থ থাকিলেই ভাল, অসুস্থ থাকিলে কষ্ট পাইতে হয়। পড়াশুনা সম্বন্ধেও ইয়ুরোপীয়দের সঙ্গে আমাদের তুলনা হয় না। তাহারা নিজের ভাষায় জ্ঞান উপার্জ্জন করে, আমরা পরের ভাষায় জ্ঞানোপার্জ্জন করি। বিদেশীয় ভাষা ও বিদেশীয় ভাব আয়ত্ত করিতে আমাদের কত সময় চলিয়া যায়, তাহার পরে সেই ভাষার ভাণ্ডারস্থিত জ্ঞান। মাতার ভাষা আমরা স্নেহের সঙ্গে শিক্ষা করি। মাতৃ দুগ্ধের সহিত তাহা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত তাহা আমরা আকর্ষণ করি। সে ভাষা আমাদের আদরের ভাষা, প্রতিদিনের সুখ দুঃখের ভাষা, সে ভাষা আমাদের মা-বাপের ভাষা, আমাদের ভাই-বোনের ভাষা, আমাদের খেলাধূলার ভাষা। আর বিমাতৃভাষা আমাদের তিক্ত ঔষধ, শক্ত পিল্, গিলিতে হয় গলায় বাধে। নাক চোক্ জলে ভাসিয়া যায়। "হি ইজ্ আপ্"—তিনি হন উপরে, "আই গেট্ ডাউন্"—আমি পাই নীচে—ইহা মুখস্ত করিতে করিতে কোন্ বাঙ্গালীর ছেলের না রক্ত জল হইয়া যায়! ভাষা নামক কেবল একটা যন্ত্র আয়ত্ত করিতে গিয়াই আমাদের হাড় গোড় সেই যন্ত্রের তলে পিষিয়া যায়। ইংরাজের কি সে অসুবিধা আছে? যে শৈশবকাল স্নেহের মাতৃদুগ্ধ পান করিবার সময়, সেই শৈশবে বিদেশী চালকড়াইভাজা দন্তহীন মাড়ি দিয়া চিবাইয়া কোন মতে গলাধঃকরণ করিতে হয়। তবুও যদি পাকশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, জ্ঞানের প্রতি অরুচি না হয়, তবে সে পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। আমাদের মাথার উপরে দারিদ্র্যের বোঝা, সম্মুখে বিদেশীয় ভাষার দুর্গম পর্ব্বত, তাড়াতাড়ি করিয়া পার হইতে হইবে। সত্য সত্যই আমাদের লাঠি ঘুরাইবার সময় নাই।

আমাদের মেয়েরাও আবার আজ কাল একজামিন্ পাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

বাঙ্গালী জাতটাই কি একেবারে এক্‌জামিন্‌ দিতে দিতে জগৎ সংসার হইতে 'পাস' হইয়া যাইবে ? পাস-করা ছেলেদেরই শরীর ত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মেয়েদের মধ্যেও কি শীর্ণ শরীর, জীর্ণ মস্তিষ্ক, রুগ্ন পাকযন্ত্র প্রচলিত হইবে ? মেয়েদেরও কি চোকে চস্‌মা, পকেটে কুইনাইন্‌, উদরে দাওয়াইখানার প্রাদুর্ভাব হইবে ? পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশায় ছয় মাস ধরিয়া উন্মাদ উত্তেজনা, এবং পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইলে হৃদয়বিদারক লজ্জা ও নিরাশা—ইহা কি আমাদের দেশের সুকুমারী বালিকাদেরও আয়ুক্ষয় করিতে থাকিবে ? পরীক্ষা-শালায় প্রবেশ করিবার সময় বড় বড় জোয়ান বালকের যে হৃৎকম্প উপস্থিত হয় তাহাতেই তাহাদের দশ বৎসর পরমায়ু হ্রাস হইয়া যায়, তবে মেয়েদের দশা কি হইবে ? মেয়েরা যে বিদ্যাশিক্ষা করিবে তাহার একটা অর্থ বুঝিতে পারি—কিন্তু মেয়েরা কেন যে পরীক্ষা দিবে তাহার কোন অর্থ বুঝিতে পারি না। এমন সযত্নে তাহাদিগকে এমন সৎশিক্ষা দাও যাহাতে জ্ঞানের প্রতি তাহাদের স্বাভাবিক অনুরাগ জন্মে। আয়ুক্ষয়কর এবং কোমল হৃদয়ের বিকারজনক প্রকাশ্য গৌরব লাভের উত্তেজনায় তাহাদিগকে নাকে চোকে জ্ঞান গিলিতে প্রবৃত্ত করান ভাল বোধ হয় না। পরীক্ষা দেওয়া গৌরব লোভে এক প্রকার জুয়া খেলা। ইহা হৃদয়ের অস্বাভাবিক উত্থান-পতনের কারণ। প্রকাশ্য গৌরব লাভের জন্য প্রকাশ্য রঙ্গভূমিতে যোঝাযুঝি করিতে দণ্ডায়মান হইলে অধিকাংশ স্থলেই হৃদয়ের দুর্মূল্য সৌকুমার্য্য দূর হইয়া যায়। কেবল তাহাই নয়, জ্ঞান লাভ গৌণ এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়। পরীক্ষার অপকার সম্পূর্ণ পাওয়া যায় অথচ জ্ঞান লাভের সম্পূর্ণ উপকার পাওয়া যায় না। আমাদের বাঙ্গালা দেশটা একটা প্রকাণ্ড ইউনিভার্সিটি চাপা পড়িয়া মরিবার উদ্যোগ হইয়াছে। এস না কেন আমরা এম-এ, বি-এ ডিগ্রিগুলি গলায় বাঁধিয়া মেয়ে পুরুষে মিলিয়া বঙ্গোপসাগরের জলে ডুবিয়া মরি ? সে বড় গৌরবের কথা হইবে। আমেরিকা ও ইউরোপ হাততালি দিতে থাকিবে।

এক কথা বলিতে গিয়া আর এক কথা উঠিল। একেবারে যে যোগ নাই তাহা নহে। স্বাস্থ্যের কথা উঠিল বলিয়া এত কথা বলিতে হইল।

সম্পাদক মহাশয় আমার প্রগল্‌ভতা মাপ করিবেন। লিখিতে বিস্তর সময় গেল, এতক্ষণ লাঠি ঘুরাইলেও হইত। যাহা হউক, এক্ষণে এক্‌জামিনের পড়া মুখস্থ করিতে চলিলাম।

বশম্বদ শ্রীঃ—

মুকুট।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজধর পরীক্ষা দিনের পূর্ব্বে যখন কমলাদেবীর সাহায্যে ইন্দ্রকুমারের অস্ত্রশালায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখনই ইন্দ্রকুমারের তূণ হইতে ইন্দ্রকুমারের নামাঙ্কিত একটি তীর নিজের তূণে তুলিয়া লইয়াছিলেন এবং নিজের নামাঙ্কিত তীর ইন্দ্রকুমারের তূণে এমন স্থানে এমন ভাবে স্থাপিত করিয়াছিলেন, যাহাতে সেইটিই সহজে ও সর্ব্বাগ্রে তাঁহার হাতে উঠিতে পারে। রাজধর যাহা মনে করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। ইন্দ্রকুমার দৈবক্রমে রাজধরের স্থাপিত তীরই তুলিয়া লইয়াছিলেন—সেই জন্যই পরীক্ষাস্থলে এমন গোলমাল হইয়াছিল। কালক্রমে যখন সমস্ত শান্তভাব ধারণ করিল তখন ইন্দ্রকুমার রাজধরের চাতুরী কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা আর কাহাকেও কিছু বলিলেন না—কিন্তু রাজধরের প্রতি তাঁহার ঘৃণা আরও দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল।

ইন্দ্রকুমার মহারাজার কাছে বারবার বলিতে লাগিলেন "মহারাজ, আরাকানপতির সহিত যুদ্ধে আমাদিগকে পাঠান্!"

মহারাজ অনেক বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

আমরা যে সময়ের গল্প বলিতেছি সে আজ প্রায় তিন শ বৎসরের কথা। তখন ত্রিপুরা স্বাধীন ছিল এবং চট্টগ্রাম ত্রিপুরার অধীন ছিল। আরাকান চট্টগ্রামের সংলগ্ন। আরাকানপতি মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম আক্রমণ করিতেন। এই জন্য আরাকানের সঙ্গে ত্রিপুরার মাঝে মাঝে বিবাদ বাধিত। অমরমাণিক্যের সহিত আরাকানপতির সম্প্রতি সেইরূপ একটি বিবাদ বাধিয়াছে। যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া ইন্দ্রকুমার যুদ্ধে যাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। রাজা অনেক বিবেচনা করিয়া অবশেষে সম্মতি দিলেন। তিন ভাইয়ে পাঁচ হাজার করিয়া পনেরো হাজার সৈন্য লইয়া চট্টগ্রাম-অভিমুখে চলিলেন। ঈশা খাঁ সৈন্যাধ্যক্ষ হইয়া গেলেন।

কর্ণফুলি নদীর পশ্চিম ধারে শিবির স্থাপিত হইল। আরাকানের সৈন্য কতক নদীর ও-পারে কতক এ-পারে। আরাকানপতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া নদীর পরপারে আছেন। এবং তাঁহার বাইশ হাজার সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আক্রমণের প্রতীক্ষায় নদীর পশ্চিম পারে অপেক্ষা করিয়া আছে।

যুদ্ধের ক্ষেত্র পর্ব্বতময়। সম্মুখাসম্মুখী দুই পাহাড়ের উপর দুই পক্ষের সৈন্য স্থাপিত হইয়াছে। উভয় পক্ষ যদি যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হয় তবে মাঝের উপত্যকায় দুই সৈন্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইতে পারে। পর্ব্বতের চারিদিকে হরিতকী আমলকী শাল ও গাম্ভা-

রীর বন। মাঝে মাঝে গ্রামবাসীদের শূন্য গৃহ পড়িয়া রহিয়াছে তাহারা ঘর ছাড়িয়া পলাইয়াছে। মাঝে মাঝে শস্যক্ষেত্র। পাহাড়েরা সেখানে ধান কাপাশ তরমুজ আলু একত্রে রোপণ করিয়া গিয়াছে। আবার এক এক জায়গায় জুমিয়া চাষারা এক একটা পাহাড় সমস্ত দগ্ধ করিয়া কালো করিয়া রাখিয়াছে, বর্ষার পর সেখানে শস্য বপন হইবে। দক্ষিণে কর্ণফুলি—বামে দুর্গম পর্ব্বত।

এইখানে প্রায় এক সপ্তাহকাল উভয় পক্ষ পরস্পরের আক্রমণ প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। ইন্দ্রকুমার যুদ্ধের জন্য অস্থির হইয়াছেন, কিন্তু যুবরাজের ইচ্ছা বিপক্ষপক্ষেরা আগে আসিয়া আক্রমণ করে। সেই জন্য বিলম্ব করিতেছেন—কিন্তু তাহারাও নড়িতে চাহে না স্থির হইয়া আছে। অবশেষে আক্রমণ করাই স্থির হইল।

সমস্ত রাত্রি আক্রমণের আয়োজন চলিতে লাগিল। রাজধর প্রস্তাব করিলেন—"দাদা, তোমরা দুইজনে তোমাদের দশহাজার সৈন্য লইয়া আক্রমণ কর। আমার পাঁচ হাজার হাতে থাক্ আবশ্যকের সময় কাজে লাগিবে।"

ইন্দ্রকুমার হাসিয়া বলিলেন "রাজধর তফাতে থাকিতে চান!"

যুবরাজ কহিলেন—"না, হাসির কথা নয়। রাজধরের প্রস্তাব আমার ভাল বোধ হইতেছে।" ইষা খাঁও তাহাই বলিলেন। রাজধরের প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল।

যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমারের অধীনে দশ হাজার সৈন্য পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইল। প্রত্যেক ভাগে দুই হাজার করিয়া সৈন্য রহিল। স্থির হইল, একেবারে শত্রুব্যূহের পাঁচজায়গায় আক্রমণ করিয়া ব্যূহভেদ করিবার চেষ্টা করা হইবে। সর্ব্বপ্রথম সারে ধানুকীরা রহিল, তাহার পরে তলোয়ার বর্শা প্রভৃতি লইয়া অন্য পদাতিকেরা রহিল এবং সর্ব্বশেষে অশ্বারোহীরা সার বাঁধিয়া চলিল।

আরাকানের মগ সৈন্যেরা দীর্ঘ এক বাঁশবনের পশ্চাতে ব্যূহ রচনা করিয়াছিল। প্রথম দিনের আক্রমণে কিছুই হইল না। ত্রিপুরার সৈন্য ব্যূহ ভেদ করিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় দিন সমস্ত দিন নিষ্ফল যুদ্ধ অবসানে রাত্রি যখন নিশীথ হইল—যখন উভয় পক্ষের সৈন্যেরা বিশ্রাম লাভ করিতেছে, দুই পাহাড়ের উপর দুই শিবিরে স্থানে স্থানে কেবল এক-একটা আগুন জ্বলিতেছে, শৃগালেরা রণক্ষেত্রে ছিন্ন হস্ত পদ ও মৃত দেহের মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া দলে দলে কাঁদিয়া উঠিতেছে—তখন শিবিরের দুই ক্রোশ দূরে রাজধর তাঁহার পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া সারবন্দী নৌকা বাঁধিয়া কর্ণফুলি নদীর উপরে নৌকার সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। একটি মশাল নাই, শব্দ নাই, সেই সেতুর উপর দিয়া অতি সাবধানে সৈন্য পার করিতেছেন। নীচে দিয়া যেমন অন্ধকারে নদীর স্রোত বহিয়া যাইতেছে তেমনি উপর দিয়া মানুষের স্রোত অবিচ্ছিন্ন বহিয়া যাইতেছে। নদীতে ভাঁটা

পড়িয়াছে। পর পারের পর্ব্বতময় দুর্গম পাড় দিয়া সৈন্যেরা অতি কষ্টে উঠিতেছে। রাজধরের প্রতি সৈন্যাধ্যক্ষ ইষা খাঁর আদেশ ছিল যে, রাজধর রাত্রিযোগে তাঁহার সৈন্যদের লইয়া নদী বাহিয়া উত্তর দিকে যাত্রা করিবেন—তীরে উঠিয়া বিপক্ষ সৈন্যদের পশ্চাদ্ভাগে লুক্কায়িত থাকিবেন। প্রভাতে যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার সম্মুখ ভাগে আক্রমণ করিবেন—বিপক্ষেরা যুদ্ধে শ্রান্ত হইলে পর সঙ্কেত পাইলে রাজধর সহসা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিবেন। সেই জন্যই এত নৌকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। কিন্তু রাজধর ইষা-খাঁর আদেশ কই পালন করিলেন? তিনি ত সৈন্য লইয়া নদীর পরপারে উত্তীর্ণ হই-লেন। তিনি আর এক কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন কিন্তু কাহাকেও কিছু বলেন নাই। তিনি নিঃশব্দে আরাকানের রাজার শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। চতু-র্দ্দিকে পর্ব্বত, মাঝে উপত্যকা, রাজার শিবির তাহারই মাঝখানে অবস্থিত। শিবিরে নির্ভয়ে সকলে নিদ্রিত। মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা দেখিয়া দূর হইতে শিবিরের স্থান নির্ণয় হইতেছে। পর্ব্বতের উপর হইতে বড় বড় বনের ভিতর দিয়া রাজধরের পাঁচহাজার সৈন্য অতি সাবধানে উপত্যকার দিকে নামিতে লাগিল—বর্ষাকালে যেমন পর্ব্বতের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া গাছের শিকড় ধুইয়া ঘোলা হইয়া জলধারা নামিতে থাকে—তেমনি পাঁচ সহস্র মানুষ, পাঁচসহস্র তলোয়ার, অন্ধকারের ভিতর দিয়া গাছের নীচে দিয়া সহস্র পথে আঁকিয়া বাঁকিয়া যেন নিম্নাভিমুখে ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু শব্দ নাই, মন্দগতি। সহসা পাঁচ সহস্র সৈন্যের ভীষণ চীৎকার উঠিল—ক্ষুদ্র শিবির যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল—এবং তাহার ভিতর হইতে মানুষগুলা কিলূকিল্ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। কেহ মনে করিল দুঃস্বপ্ন, কেহ মনে করিল প্রেতের উৎপাত, কেহ কিছুই মনে করিতে পারিল না।

রাজা বিনা রক্তপাতে বন্দী হইলেন। রাজা বলিলেন "আমাকে বন্দী করিলে বা বধ করিলে যুদ্ধের অবসান হইবে না। আমি বন্দী হইবামাত্র সৈন্যেরা আমার ভাই হামচুপামুকে রাজা করিবে। যুদ্ধ যেমন চলিতেছিল তেম্‌নি চলিবে। আমি বরঞ্চ পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিই, আমার বন্ধন মোচন করিয়া দিন।"

রাজধর তাহাতেই সম্মত হইলেন। আরাকানরাজ পরাজয় স্বীকার করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিলেন। একটি হস্তিদন্তনির্ম্মিত মুকুট, পাঁচ শত মণিপুরী ঘোড়া, ও তিনটে বড় হাতী উপহার দিলেন, এইরূপ নানা ব্যবস্থা করিতে করিতে প্রভাত হইল—বেলা হইয়া গেল। সুদীর্ঘ রাত্রে সমস্তই ভূতের ব্যাপার বলিয়া মনে হইয়াছিল, দিনের বেলা আরাকানের সৈন্যগণ আপনাদের অপমান স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিল। চারিদিকে বড় বড় পাহাড় সূর্য্যালোকে সহস্র চক্ষু হইয়া তাহাদিগের দিকে তাকাইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। রাজধর আরাকানপতিকে কহিলেন—"আর বিলম্ব নয়—শীঘ্র যুদ্ধ

নিবারণ করিয়া এক আদেশপত্র আপনার সেনাপতির নিকট পাঠাইয়া দিন। ওপারে এতক্ষণে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেছে।"

কতকগুলি সৈন্য সহিত দূতের হস্তে আদেশপত্র পাঠান হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অতি প্রত্যুষেই অন্ধকার দূর হইতে না হইতেই যুবরাজ ও ইন্দ্রকুমার দুই ভাগে পশ্চিমে ও পূর্ব্বে মগদিগকে আক্রমণ করিতে চলিয়াছেন। সৈন্যের অল্পতা লইয়া রূপনারায়ণ হাজারী দুঃখ করিতেছিলেন—তিনি বলিতেছিলেন আর পাঁচ হাজার লইয়া আসিলেই ভাবনা ছিল না। ইন্দ্রকুমার বলিলেন—"ত্রিপুরারির অনুগ্রহ যদি হয় তবে এই কয় জন সৈন্য লইয়াই জিতিব, আর যদি না হয় তবে বিপদ আমাদের উপর দিয়াই যাক্, ত্রিপুরাবাসী যত কম মরে ততই ভাল। কিন্তু হরের কৃপায় আজ আমরা জিতিবই।" এই বলিয়া হর হর বোম্ বোম্ রব তুলিয়া কৃপাণ বর্শা লইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া বিপক্ষদের অভিমুখে ছুটিলেন—তাঁহার দীপ্ত উৎসাহ তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণা বাতাসে খড়ের চালের উপর দিয়া আগুন যেমন ছোটে, তাঁহার সৈন্যেরা তেমনি ছুটিতে লাগিল। কেহই তাহাদের গতিরোধ করিতে পারিল না। বিপক্ষদের দক্ষিণ দিকের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। হাতাহাতি যুদ্ধ বাধিল। মানুষের মাথা ও দেহ কাটা-শস্যের মত শস্যক্ষেত্রের উপর গিয়া পড়িতে লাগিল। ইন্দ্রকুমারের ঘোড়া কাটা পড়িল। তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। রব উঠিল তিনি মারা পড়িয়াছেন। কুঠারাঘাতে এক মগ অশ্বারোহীকে অশ্বচ্যুত করিয়া ইন্দ্রকুমার তৎক্ষণাৎ তাহার ঘোড়ার উপর চড়িয়া বসিলেন। রেকাবের উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার রক্তাক্ত তলোয়ার আকাশে সূর্য্যালোকে উঠাইয়া বজ্রস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"হর হর বোম্ বোম্!" যুদ্ধের আগুন দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া মগদিগের বামদিকের ব্যূহের সৈন্যগণ আক্রমণের প্রতীক্ষা না করিয়া সহসা বাহির হইয়া যুবরাজের সৈন্যের উপর গিয়া পড়িল। যুবরাজের সৈন্যেরা সহসা এরূপ আক্রমণ প্রত্যাশা করে নাই। তাহারা মুহূর্ত্তের মধ্যে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। তাহাদের নিজের অশ্ব নিজের পদাতিকদের উপর গিয়া পড়িল, কোন্‌দিকে যাইবে ঠিকানা পাইল না। যুবরাজ ও ইষা খাঁ অসম সাহসের সহিত সৈন্যদের সংযত করিয়া লইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অদূরে রাজধরের সৈন্য লুকায়িত আছে কল্পনা করিয়া সঙ্কেত স্বরূপে বারবার তুরি নিনাদ করিলেন কিন্তু রাজধরের সৈন্যের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। ইষা খাঁ বলিলেন—"তাহাকে ডাকা বৃথা! সে শৃগাল দিনের বেলা গর্ত্ত হইতে বাহির হইবে না!" ইষা খাঁ ঘোড়া হইতে মাটিতে লাফাইয়া পড়িলেন। পশ্চিম মুখ করিয়া সত্বর নামাজ পড়িয়া লইলেন। মরিবার

জন্য প্রস্তুত হইয়া "মরিয়া" হইয়া লড়িতে লাগিলেন। চারিদিকে মৃত্যু যতই ঘেরিতে লাগিল, দুর্দান্ত যৌবন ততই যেন তাঁহার দেহে ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এমন সময় ইন্দ্রকুমার শত্রুদের এক অংশ সম্পূর্ণ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন যুবরাজের একদল অশ্বারোহী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পলাইতেছে, তিনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া লইলেন। বিদ্যুৎ বেগে যুবরাজের সাহায্যার্থে আসিলেন কিন্তু সে বিশৃঙ্খলার মধ্যে কিছুই কূলকিনারা পাইলেন না। ঘূর্ণা বাতাসে মরুভূমির বালুকারাশি যেমন ঘুরিতে থাকে, উপত্যকার মাঝখানে যুদ্ধ তেমনি পাক খাইতে লাগিল। রাজধরের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বারবার তূরীধ্বনি উঠিল, কিন্তু তাহার কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

সহসা কি মন্ত্রবলে সমস্ত থামিয়া গেল—যে যেখানে ছিল স্থির হইয়া দাঁড়াইল—আহতের আর্তনাদ ও অশ্বের হ্রেষা ছাড়া আর শব্দ রহিল না। সন্ধির নিশান লইয়া লোক আসিয়াছে। মগের রাজা পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। হর হর বোম্ বোম্ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া গেল। মগ সৈন্যগণ আশ্চর্য্য হইয়া পরস্পরের মুখ চাহিতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

রাজধর যখন জয়োপহার লইয়া আসিলেন, তখন তাঁহার মুখে এত হাসি যে তাঁহার ছোট চোখ দুটা বিন্দুর মত হইয়া পিট্‌পিট্ করিতে লাগিল। হাতির দাঁতের মুকুট বাহির করিয়া ইন্দ্রকুমারকে দেখাইয়া কহিলেন—"এই দেখ, যুদ্ধের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এই পুরস্কার পাইয়াছি।"

ইন্দ্রকুমার ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"যুদ্ধ! যুদ্ধ তুমি কোথায় করিলে! এ পুরস্কার তোমার নহে। এ মুকুট যুবরাজ পরিবেন।"

রাজধর কহিলেন—"আমি জয় করিয়া আনিয়াছি; এ মুকুট আমি পরিব!"

যুবরাজ কহিলেন "রাজধর ঠিক কথা বলিতেছেন, এ মুকুট রাজধরেরই প্রাপ্য।"

ইশা খাঁ চটিয়া রাজধরকে বলিলেন—"তুমি মুকুট পরিয়া দেশে যাইবে! তুমি সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধ হইতে পালাইলে এ কলঙ্ক একটা মুকুটে ঢাকা পড়িবে না। তুমি এক্‌টা ভাঙ্গা হাঁড়ির কানা পরিয়া দেশে যাও, তোমাকে সাজিবে ভাল!"

রাজধর বলিলেন—"খাঁ সাহেব, এখন ত তোমার মুখে খুব বোল ফুটিতেছে—কিন্তু আমি না থাকিলে তোমরা এতক্ষণে থাকিতে কোথায়!"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন—"যেখানেই থাকি, যুদ্ধ ছাড়িয়া গর্ত্তের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতাম না!"

যুবরাজ বলিলেন—"ইন্দ্রকুমার তুমি অন্যায় বলিতেছ সত্যকথা বলিতে কি—রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের বিপদ হইত!"

ইন্দ্রকুমার বলিলেন—"রাজধর না থাকিলে আজ আমাদের কোন বিপদ হইত না!